লালু ভুলু

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দ্বিতীয় মিত্র-ঘোষ সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৭১

—পাঁচ টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীবিভূতি গুপ্ত

মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

লালু-ভুলু

শিয়ালদহ স্টেশন ছাড়িয়ে আধ মাইলটাক এগিয়ে যে চওড়া রাস্তাটা হ্যারিসন রোডকে ডিঙিয়ে সোজা চলে গিয়েছে, সেই আমহার্স্ট স্ট্রিটের উপরেই পার্কের একেবারে কাছাকাছি লাল-ফটকওয়ালা মস্ত বড় বাড়িটা। ফটকের পাশেই টুলের উপরে সর্বক্ষণ বসে থাকতে দেখা যায় পাগড়ি-আঁটা এক হোমরা-চোমরা শিখ দারোয়ানকে, কোমরে কিরিচ, কাঁধে রাইফেল, চোংটা তার আলোয় ঝকঝক করে।

মস্ত বড় লোহার ফটক। ফটকের তুপাশে চমৎকার কারুকার্য করা তুটো থাম্বার উপরে লোহার ফ্রেমে কাচের বাতিদানে তুটি বাতি। সন্ধ্যার কিছু আগে বাতি তুটো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সারারাত জ্বলে। ফটক পার হয়ে লাল-মুড়ি ঢালা চওড়া রাস্তা একেবারে গা পোর্টিকোর নিচে বরাবর চলে গিয়েছে, যেখানে চওড়া সিঁড়ির শে মস্ত বড় তুটো শ্বেতপাথরের সিংহ কেশর ফুলিয়ে লেজ তুলে ড়িয়ে আছে নিশ্চল তুই দ্বাররক্ষীর মতো।

সকাল থেকে বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত দেখা যায় মস্ত বড় একটা কালো রঙের চকচকে বুইক গাড়ি পোর্টিকোর নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে গাড়িটা গেট দিয়ে বার হয়ে যায়।

রাইফেল হাতে শিখ দারোয়ান টুল ছেড়ে উঠে গেটের পাশে সেলাম জানায়।

সারাদিনের মধ্যে গাড়িটা আর ফিরবে না, ফিরবে সেই সন্ধ্যা নাগায়।

লালু ভুলু জানে ঐ সময়টা।

তারা রাজপুত্রের কাছে যায় সেইদিন বেলা পৌনে

দশটা থেকে সামনের পার্কের ধারে বড় বাদাম গাছটার নিচে অপেক্ষা করে তারা।

গাড়িটা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পাঁচিল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলে বাড়িটার পশ্চিম দিকে সরু অন্ধ গলিটার মধ্যে।

গলিমুখো নির্দিষ্ট জানালাটার কাছে গিয়ে চুপিসাড়ে ওরা দাঁড়ায়।

রাজপুত্তুর আসবে এবারে জানালার শিকগুলোর ওপাশে। ফরসা ধবধবে চেহারা। মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে রক্তশূন্য। কী সুন্দর বাঁশির মতো নাক, টানাটানা হরিণের মতো কী সুন্দর চোখ দুটি। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। পরনে থাকে কো রাজপুত্তুরের সাদা প্যাণ্ট ও সাদা সিল্কের শার্ট। কোনদিন পাঞ্জাবি। আবার কোনদিন বা সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি।

লালুর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই হাসে রাজপুত্তুর। নি সেই হাসিটির যেন তুলনা নেই।

ভুলু অন্ধ। দুটো চোখেরই আলো তার চিরদিনের মতো নিভে গেছে, দেখতে পায় না। লালু তার চোখ দিয়ে দেখে চুপিচুপি বন্ধুর কানে কানে বলে, রাজপুত্তুর এসেছে ভুলু।

লালু খোঁড়া। লালুর একটা পা হাঁটু অবধি কাটা। একজোড়া কাঠের ক্রাচের উপরে দুই বগল রেখে ভর দিয়ে ঠকঠক করে লালু চলে, আর তার কাঁধে হাত রেখে তার পিছনে পিছনে চলে ভুলু।

লালু ভুলু!

একটি অন্ধ, একটি খোঁড়া। একই বয়সের দুইটি কিশোর। বারো থেকে তেরোর মধ্যে দুজনার বয়স।

লালু রোগা ডিগডিগে, এককালে হয়তো গায়ের রঙ ফরসা ছিল; এখন রোদে জলে পুড়ে পুড়ে কেমন যেন তামাটে হয়ে গিয়েছে। পরনে একটা ছিটের ছেঁড়া হাফ শার্ট ও কালো হাফপ্যান্ট। ভুলুর চেহারাটা কিন্তু বেশ সবল। গায়ের

কালো গায়ের রঙ। সামনের হাত দুটো সামান্য উঁচু।

খোঁড়া লালু বাজায় মাউথ অর্গান, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার সুর মিলিয়ে শিশ দেয় অন্ধ ভুলু। বাঁশি ও শিশের অপূর্ব ঐকতান।

এমন করেই ওরা ঐ অঞ্চলের চারিদিকে, এদিকে শিয়ালদহ স্টেশন ওদিকে রাজাবাজার ও অন্যদিকে বৌবাজার ও কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত, মাউথ অর্গান ও শিশের ঐকতান শুনিয়ে রোজগার করে বেড়ায়।

অন্য আর দশজন গৃহহীন পথচারীর মতো ব্যাপারটাকে ওরা ভিক্ষা করা বলে না, বলে উপার্জন।

তবে সারাটা দিনই কিন্তু ওরা উপার্জন করে না।

দুবেলা খাওয়ার মতো পয়সা হলেই ওরা আর উপার্জন করে না। কোন পার্কের বেঞ্চির ওপরে বা রাস্তার ধারে কোন নির্জন ফুটপাথে গিয়ে ওরা দুটি বন্ধুতে বসে। বসে বসে কী যে দুজনে গল্প করে তা ওরাই জানে।

রাত্রে কলেজ স্ট্রীটের বড় বড় দোকানগুলোর শেডের তলায় শুয়ে ওরা ঘুমোয়।

ওদের মাউথ অর্গান ও শিশের মিলিত ঐকতান শোনেনি ঐ অঞ্চলে খুব কম লোকই আছে। বছরখানেক ধরেই ওদের দেখা যাচ্ছে ঐ অঞ্চলের পথে পথে।

মানিকজোড় লালু ভুলু। একটি খোঁড়া, একটি অন্ধ। [illegible] বারে অভিন্নহৃদয়। কখনো কেউ ওদের আলাদা আলাদা দেখবে না।

কিন্তু যত কাজই থাক্, ওরা লালবাড়ির ঐ পিছনের গলিতে ঠিক বেলা সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে একসময় খোলা জানালাটার সামনে এসে একবার দাঁড়াবেই হপ্তায় অন্তত দু-তি[illegible] দিন। লালবাড়ির রাজপুত্তুরের সঙ্গে ওদের দেখা হওয়া চাই-[illegible]

[illegible]রাজপুত্তুরকে হপ্তায় অন্তত দু-একবার না দেখলে যেন ওদের [illegible]

[illegible] একজন অবশ্য চোখে দেখে, অন্যজন শোনে কণ্ঠ[illegible]

ঘরছাড়া দিকহারা দুটি পথিক কিশোরের অপূর্ব ঐ স্বপ্নবিলাস।

লালবাড়ির রাজপুত্তুর। সুরজিৎ। সুরজিতের নামটাও ওরা জানে না। জানে ও লালবাড়ির রূপকথার রাজপুত্তুর। বাঁশির মতো নাক, হরিণের মত চোখ রেশমের মতো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। মোমে গড়া যেন দেহখানি। মোমের মতো রঙ। ওদের মাউথ অর্গান ও শিশের ঐকতান শুনেই অকস্মাৎ একদিন আকৃষ্ট হয়েছিল লালবাড়ির রাজপুত্তুর। ছুটে এসেছিল খোলা জানালার ধারে। ডাক্তারের কড়া নিষেধ—উপর থেকে নিচে নামা চলবে না। কিন্তু ঐ সময়টা সৎমা যান স্নানঘরে, দিদি যায় কলেজে—সেই ফাঁকে পালিয়ে চুপিচুপি চলে এসেছিল নিচে রাজপুত্তুর।

সুরেন ও-বাড়ির অনেক দিনকার পুরাতন চাকর। সুরজিৎকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সুরেনকেই ডেকে বলেছিল সুরজিৎ, ঐ বাজনা শুনব। কে, কে বাজায়? ডাকো না ওদের, লক্ষ্মীটি সুরেনদা।

কি করে সুরেন। পিছনের গলিতে ডেকে এনেছিল চুপিচুপি লালু ভুলুকে, রাস্তায় ওরা তখন বাজাচ্ছিল।

সেই বাজনার মধ্যে দিয়েই আলাপ। বাজনা শেষ হলে পুরো একটা আধুলি সুরেনের কাছ থেকে চেয়েই দিয়েছিল লালু ভুলুকে সুরজিৎ।

[illegible] বলেছিল, আবার আসবে তো তোমরা কাল?

লালু ভুলু মাথা নেড়ে বলেছিল, আসব।

হ্যাঁ, এই সময় এসো। এসো কিন্তু—

আসব!

[illegible]ছিল লালু ভুলু পরের দিনও ঠিক ঐ সময়ে।

[illegible] শুনি। সুরজিৎ পরের দিন বলেছিল।

[illegible] শোনার পর সুরজিৎ আধুলি নয়, পুরোপুরি [illegible] টাকাই যখন ওদের দিতে গেল ওরা কিন্তু ঘাড় দুলিয়ে বললে, না।

না কেন। নেবে না ?

না।

সুরজিতের চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। বলে, আর তো নেই। কাল এসো, আরো বেশি দেব।

না। তোমার কাছে কিছু আমরা চাই না।

রাগ করেছ ? নেবে না কেন ?

না। তোমাকে মধ্যে মধ্যে এসে আমরা বাজনা শুনিয়ে যাব। কিছু চাই না।

ছি ছি। রাজপুত্তুরের কাছ থেকে কি ওরা নিতে পারে! এত ভালো লাগে রাজপুত্তুরকে! যাকে ভালো লাগে তার কাছে বুঝি কাঙালের মতো হাত পাতা যায়! লজ্জা করে না বুঝি!

বিনিময়ে কিছুই ওরা নেয় না; কিন্তু প্রায়ই আসে। প্রায়ই বাজনা শুনিয়ে যায়। দুজন থাকে রাস্তায়, একজন খোঁড়া, একজন অন্ধ। আর একজন রুগ্ন, ফ্যাকাশে। থাকে জানালার ওপাশে লাল-বাড়ির মধ্যে যেখানে ওদের প্রবেশ নিষেধ। যেখানে দুই-মানুষ-প্রমাণ উঁচু পাথরের প্রাচীরের কঠিন অনুশাসন চতুঃসীমানায়।

এমনি করেই দিনের পর দিন মধুর এক সৌহার্দ্য প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে রাস্তা ও প্রাসাদের মধ্যে।

দুটি অন্ধ ও খোঁড়া পথচারী সহায়-সম্বলহীন কিশোর আর এক ধনীর রুগ্ন দুলাল কিশোর! আভিজাত্য ও সম্পদের ধাইরে ধনী-নির্ধনের গণ্ডি পেরিয়ে চলে তিনটি সুকুমার কিশোর-হৃদয়ের চিরন্তন দেওয়া-নেওয়া!

॥ ছুই ॥

ভুলু চিরদিনই কিন্তু অন্ধ ছিল না। আট বছর বয়স থেকে ক্রমে সে চোখে একটু একটু করে কম দেখতে শুরু করে। তখন ছিল ও গ্রামে। ওর বাবা গ্রামের স্কুলের গরীব মাস্টার, মাইনে মোটে চল্লিশ টাকা। চার-পাঁচটি ভাইবোন, চল্লিশটি টাকায় গ্রামে ভাত-কাপড় কোনমতে জুটলেও চোখের সে রকম উপযুক্ত চিকিৎসা করার টাকা কোথায়। ক্রমে চোখ খারাপ হয়েই যেতে থাকে, গ্রামের টোটকা টাটকা চিকিৎসা প্রথমে চলে। তার পরে একটু-আধটু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাও হয়, কিন্তু কোনও ফল হয় না তাতে। তারপর হঠাৎ এল পাকিস্তান হিন্দুস্থান দেশবিভাগের হিড়িক। কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল ভালো করে মনেও পড়ে না। কোনমতে একা প্রাণ নিয়ে বেঁচে একদল বাস্তুত্যাগীর সঙ্গে কখনো রেলে চড়ে, কখনো নৌকায় চেপে এবং অবশেষে হেঁটে ভুলু একদিন কলকাতায় এসে পৌঁছল।

কলকাতায় পৌঁছবার প্রায় কয়েক দিনের মধ্যে সে দেখল চোখে আর একেবারেই দেখতে পায় না। সামান্য একটু আলো যা এতদিন চোখের ভিতরে পৌঁছচ্ছিল তাও ঢেকে গেল সহসা যেন নিকষ কালো অন্ধকারে। হাতড়ে হাতড়ে ফুটপাথ ধরে চলে, কেউ দুটি দয়া করে খেতে দিলে খায়, নচেৎ উপোস। এতকালের চেনা পরিচিত পৃথিবীটা হঠাৎ যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। শুধু কানে শুনে শুনে সেই হারিয়ে-যাওয়া পৃথিবীটাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করে নানা বিচিত্র শব্দতরঙ্গের মধ্যে দিয়ে লুব্ধের মতো।

এমনি করেই একদিন দুপুরে ফুটপাথ ধরে হাতড়ে হাতড়ে চলেছে। হঠাৎ কিসে বাধা পেয়ে হুমড়ি খেয়ে কার ঘাড়ের উপর পড়তেই সে খিঁচিয়ে ওঠে, অন্ধ নাকি, চোখে দেখতে পাস না!

সত্যিই চোখে আমি দেখতে পাই না ভাই। আমি যে অন্ধ।

অন্ধ! কোমল স্নেহকরুণ কিশোর-কণ্ঠে প্রশ্ন আসে।

সকাল থেকে মাউথ অর্গান বাজিয়ে বাজিয়ে সত্যিই সেদিন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল লালু, একটি পয়সাও মেলে নি, একটি আধলাও উপার্জন হয় নি। মধ্যে মধ্যে অমন হয়।

অথচ খিদেও পেয়েছিল। কিন্তু পকেটে মাত্র চারটি পয়সা অবশিষ্ট পড়ে আছে।

খোঁড়া, নিজে সে অসহায়। তাই হঠাৎ নিজের সমবয়সী আর একজন অন্ধ অসহায়কে দেখে মনটা তার যেন কেমন করুণ হয়ে আসে অকস্মাৎই।

অন্ধ! দেখতে পাস না! হাত ধরে তুলে পাশে বসিয়ে প্রশ্ন করে লালু।

না।

একেবারেই দেখতে পাস না বুঝি?

না।

কোন দিনই দেখতে পেতিস না?

আগে পেতাম। আজকাল আর দেখতে পাই না।

হুঁ। কি যেন মনে মনে ভাবে লালু।

অন্ধ ভুলু তখন আবার উঠে চলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছিস? প্রশ্ন করে লালু সচকিত হয়ে।

একটু এগিয়ে গেলেই একটা হোটেল আছে, কাল থেকে কিছু খাই নি, হোটেলের ঝিটা মাঝে মাঝে দুমুঠো খেতে দেয়, দেখি যদি……

ভিক্ষা করে খাবি?

তা ছাড়া আর কে খেতে দেবে ভাই!

ভিক্ষা করতে লজ্জা করে না? চোখ না হয় নেই, কিন্তু হাত

পা মুখ তো রয়েছে, ভিক্ষা করবি কেন ?

ভুলু চুপ করে থাকে।

বোস। বোস।

কি জানি কি ভেবে ভুলু বসে পড়ে আবার।

কি নাম রে তোর ?

ভুলু।

কি বললি, ভুলু ? বাঃ বেশ নামটা তো তোর। আমার নাম কি জানিস ? লালু। তুই অন্ধ আর আমি খোঁড়া। ডান পাটা আমার হাঁটু থেকে নেই।

আহা, কেটে গেছে বুঝি ডান পাটা ?

হ্যাঁ। ইঞ্জিনের তলায় পড়ে চাকায় কেটে গেল। মরেই যাচ্ছিলাম। পাটার উপর দিয়েই গেল।

কোথায় থাক তুমি ?

কোথায় আবার, রাস্তায়।

কেন, বাড়ি নেই তোমার ? ভুলু প্রশ্ন করে।

না।

তোমারও বুঝি পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল ? সব গেছে ?

না।

তবে ?

তুই বোস। বলব পরে। আগে দেখি কিছু খাবারের যোগাড় করতে পারি কিনা। বোস, যাস না যেন কোথাও বুঝলি ?

লালু ভুলুকে বসিয়ে রেখে চলে গেল।

একটু পরে ফিরে এল চার পয়সার একঠোঙা মুড়ি নিয়ে।

দুজনে ভাগ করে সেই মুড়ি খেল। এমন করে কলকাতায় আসবার পর কেউ ভুলুকে খেতে দেয় নি।

মুড়ি খেতে খেতে তার অন্ধ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

মনে পড়ে দিদির কথা।

দিদি তার কলকাতারই আশেপাশে কোথায় যেন কোন্ স্কুলে টীচারি করে। নাম-ধাম তার জানা নেই।

ভেবেছিল কলকাতায় একবার এসে পৌঁছতে পারলে দিদির খোঁজ ঠিক সে করে নেবে। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। আরো সম্ভব হয় নি একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়ে।

শিক্ষয়িত্রী বীণা রায়ের খোঁজ কেউ তাকে দিতে পারে নি। তবু সে যতদিন খুব আবছা সামান্য দেখতে পেত, স্কুল দেখলেই গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াত হাতড়ে হাতড়ে। দারোয়ানকে জিজ্ঞাস করত, এখানে বীণা রায় বলে কোন টীচার আছেন জান দারোয়ান।

কিন্তু দারোয়ান তার ছিন্ন মলিন বেশভূষা দেখে হাঁকিয়ে দিয়েছে, হট যাও। কোই নেই হ্যায় ইধার।

তারপর তো চোখের দৃষ্টি একেবারেই গেল। দিদির খোঁজ নেওয়ার পথও বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের মতোই।

তারপর থেকে বলতে গেলে অসহায় অন্ধ ভুলু। পথে পথেই ঘুরে বেড়ায়।

তারপর দেখা খোঁড়া লালুর সঙ্গে।

লালু আর ভুলু সেই থেকে একসঙ্গেই থেকে গেল।

সন্ধ্যার সময় সেদিন লালু বললে, চল।

কোথায়?

কলেজ স্ট্রীটে। সেখানেই তো রাত কাটাই।

কি ভেবে ভুলু বললে, চল।

পরের দিন ঘুম ভাঙলে আবার লালু বললে, চল।

কোথায়?

রোজগার করতে। বলতে বলতে পকেট থেকে মাউথ অর্গানটা বার করে বার দুই বাজালে লালু।

ভুলু বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়।

কি বাজনা ওটা ভাই ?

মাউথ অর্গান।

বেশ সুন্দর তো !

হ্যাঁ।

লালুর মাউথ অর্গানের বাজনা শুনে ভুলুর মনের মধ্যে অতীতের একটা সুর, যার উপরে কঠোর অনুশাসনের একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল সে, এতদিন পরে সহসা সেই সুরটা যেন সমস্ত নিষেধের পাথর ঠেলে বন্যার প্লাবনের মতোই বেঁরিয়ে আসতে চায়। কোনমতেই তাকে আর ভুলু যেন রোধ করতে পারে না।

সে ধীরে ধীরে লালুর মাউথ অর্গানের সঙ্গে সেই সুরকে মুক্তি দেয় প্রথমে শিশ দিয়ে।

শিশ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে লালুর মাউথ অর্গানের বাজনাকে অনুসরণ করে।

লালু বলে, বাঃ চমৎকার শিশ দিতে পারিস তো তুই ভুলু; দে, দে আমার বাজনায় সঙ্গে, দিয়ে যা।

ভুলুও উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

চল, আমি বাজাব মাউথ অর্গান, তুই দিবি শিশ; চমৎকার শোনা যাবে, রোজগারও বেশি হবে।

এমনি করেই শুরু হয় মাউথ অর্গান ও শিশের ঐকতান, এবং তার সাহায্যে রোজগার করে দুই কিশোর দিন কাটায়। মন্দ পয়সা উপার্জন হয় না তাদের। পেট চলে যায় দুজনের কোনমতে। খুব বেশি রোজগার না হলেও ওতেই ওরা খুশী। মধ্যে মধ্যে লালুর মনে কেবল কি যেন এক অসন্তোষ জাগে। গুমরে মরে লালু। কিন্তু কেন ?

॥ তিন ॥

অন্ধ ভুলু তার নিজের পরিচয় দিলেও তার খোঁড়া বন্ধু লালুর কাছ থেকে কোনদিন তার নিজের সম্পর্কে কোন কথাই বলতে শোনে নি সে। কোথায় তার বাড়ি, কাদের ছেলে, মা-বাপ তার কে, কেমন করেই বা পথের ধুলোয় তার মতো ছিটকে এসে পড়ল, জিজ্ঞাসা করেও কখনো কোন জবাব পায় নি ভুলু। কেবল একদিন—

আজও সে-রাতটার কথা মনে আছে ভুলুর, প্রচণ্ড শীতে কুঁকড়ে দুজনে কলেজ স্ট্রীটের একটা ঝোলানো বারান্দার নিচে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ একটা চাপা কান্নার শব্দে ভুলুর ঘুমটা ভেঙে গেল। বেচারী চোখে তো কিছু দেখতে পায় না, কেবল শুনতে পেল কে যেন খুব কাছেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চাপা কান্নায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

নিঝুম রাত। কেউ কোথাও জেগে নেই শহরের মধ্যে। কেবল শীতের শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া গা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আর সেই স্তব্ধ নিঝুম শীতের রাত্রি যেন কার কান্নায় গুমরে গুমরে উঠছে।

কে? কে কাঁদছে রে?

কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল চাপা কান্নার শব্দটাই শোনা যেতে লাগল থেকে থেকে, একটানা যেন।

হঠাৎ অন্ধ ভুলুর মনে হয় তার পাশে লালুই কাঁদছে না তো! আর একটু ভালো করে কান পেতে শুনে বুঝতে পারে, হ্যাঁ লালুই, লালুই কাঁদছে।

এবার ভুলু ডাকলে, লালু, লালু, কাঁদছিস কেন রে?

হঠাৎ কান্নার শব্দটা থেমে যায়। ভুলুর আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, এতক্ষণ লালুই কাঁদছিল গুমরে গুমরে অমনি করে।

ভুলুর ডাকে, কিন্তু লালু সাড়া দেয় না। আবার ভুলু ডাকে, লালু, কথা বলছিস না কেন রে? বল্ না, কেন কাঁদছিলি?

কি হয়েছে বলবি নে ভাই ? আমি স্পষ্ট শুনলাম তুই কাঁদছিলি।

হ্যাঁ, তোকে বলেছে আমি কাঁদছিলাম। কাঁদতে যাব কোন্ দুঃখে।

বল্ না ভাই কাঁদছিলি কেন ? কি হয়েছে বল্ না ?

কিচ্ছু হয় নি, তুই ঘুমো।

মন কেমন করছিল বুঝি কারো জন্যে ভুলু আবার জিজ্ঞাসা করে।

কার জন্য আবার মন কেমন করবে, আমার কেউ আছে নাকি !

সত্যি তোর কেউ নেই ? মা বাপ, ভাই বোন,- কেউ ?

না। কেউ আমার নেই।

আমার কাছে তুই মিথ্যা কথা বলছিস, তাই কখনও হয় নাকি ?

কেন হবে না ? কেউ আমার নেই। কণ্ঠে অস্বাভাবিক একটা জোর দিয়ে কথাগুলো বলে লালু। যেন ব্যাপারটাকে একেবারে অস্বীকার করতে চায়।

সত্যি লালুর এ সংসারে আজ কেউ নেই। কিন্তু একদিন সবই ছিল লালুর। ছোট্ট সংসার—মা বাবা আর সে। গরীব কেরানী বাপ, সামান্য আয়। তবু সংসারে কোন দুঃখ ছিল না। হাসি ও আনন্দে ভরা ছিল তাদের সংসারটি, কিন্তু কি কুক্ষণে যে একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে তার বাপ ট্রাম চাপা পড়ে মারা গেলেন, অন্ধকার ঘনিয়ে এল তাদের আনন্দের ঘরে। নিষ্ঠুর দারিদ্র্য চারিদিক থেকে তাদের মা ও ছেলেকে যেন গ্রাস করল। তবু লালুর মা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁর ছেলেকে মানুষ করে তুলতে। পরের বাড়িতে রাঁধুনী-বৃত্তি করে ছেলেকে তিনি মানুষ করছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর ভগবান তাও সইতে পারলেন না। ছিনিয়ে নিলেন তার একমাত্র সম্বল মাকে। ক্ষয় রোগ এসে মার বুকে বাসা বাঁধল, ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ করে নিতে লাগল তার মার জীবনী-শক্তিকে।

বলতে গেলে একপ্রকার বিনা চিকিৎসাতেই মা তার মারা গেলেন।

আগেই স্কুল থেকে নাম কাটা গিয়েছিল লালুর, এবারে সে পথে

এসে দাঁড়াল। কিন্তু মায়ের চরিত্রের একটা জিনিস লালু পুরোপুরিই পেয়েছিল,—তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ।

মা বলতেন, হাত পেতে ভিক্ষার মতো দৈন্য কিছু নেই বাবা।

তাই লালু পথে এসে দাঁড়ালেও পেটের জন্য একদিনও হাত পেতে ভিক্ষা করে নি কারো দয়া।

মা তার জন্মদিনে তাকে একটি মাউথ অর্গান উপহার দিয়েছিলেন, সেইটি বাজিয়ে সামান্য যা উপার্জন হতে লাগল তাই দিয়েই সে চালাতে লাগল তার দিন কোনমতে।

শহর ছাড়িয়ে দু-দশ মাইলের মধ্যে স্টেশনগুলো, সেই সব স্টেশনে স্টেশনে মাউথ অর্গান বাজিয়ে লালু দিব্যি রোজগার করে বেড়াত এবং এইভাবেই একদিন রেলের লাইন পার হতে গিয়ে আচমকা চলন্ত ট্রেনের চাকার তলায় পড়ে, একটা পা তার কেটে যায়। স্টেশনের লোকরাই তাকে শহরের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিল। ঐ সব অতীত দিনের কথা, সে একেবারে তার জীবনের পাতা থেকে মুছে ফেলতে চায় বলেই না সে ভুলুর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে চুপটি করে থাকে।

হ্যাঁ, সে সবাইকে ভুলতেই চায়। তার কেউ নেই। সে শুধু একলা এই পৃথিবীতে। তাই তো সে ভুলুকে বলে, আমার কেউ নেই এই পৃথিবীতে।

॥ চার ॥

কিন্তু এমন করেই বা ফুটপাথে রাত কাটিয়ে, সারাটা দিন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে দিন কাটানো যায় কেমন করে? একদিন যাদের ঘর ছিল, সমাজ ছিল, ভদ্র সংযত জীবনধারণ ছিল, মা বাপ ভাই বোনের স্নেহ-ভালবাসা দয়া-মায়া ছিল, আচ্ছাদন-

হীন, শৃঙ্খলাহীন পথের নিয়মকানুনহীন জীবন যাপনের মধ্যে তারা শান্তি বা সুখ পাবে কেন? কেমন করেই বা তারা সুখে থাকবে, তৃপ্তি পাবে? লালু ভুলু পরস্পর পরস্পরের কাছে মুখের কথায় কেউ কখনো সেটা প্রকাশ না করলেও মনে মনে দুজনাই যেন হাঁপিয়ে ওঠে। একটা অসোয়াস্তি, কিসের একটা অভাব-বোধ থেকে থেকে যেন তাদের মনে বেদনা জাগায়।

বিশেষ করে খোঁড়া লালু যখন পথ চলতে চলতে হঠাৎ কোন স্কুলের সামনে গিয়ে পড়ে থমকে দাঁড়ায়, পথ থেকেই সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে পায় স্কুলের জানালা দিয়ে ঘরে ঘরে ক্লাস চলেছে, ছেলের দল তার বয়েসী সব, বেঞ্চে সার বেঁধে বসে শিক্ষকের পড়ানো শুনছে: তখন তার মনে পড়ে যায় ছেড়ে-আসা অতীত জীবনের স্কুলের আনন্দ-মুখর দিনগুলোর কথা!

সারদানন্দ হাই স্কুল। সেখানকার হেড মাস্টার, সেকেণ্ড মাস্টার, বিশেষ করে বৃদ্ধ থার্ড মাস্টার কেদারবাবুর কথা। প্রতি শনিবার শনিবার তিনি মহাভারতের গল্প বলতেন। মনে পড়ে সহপাঠী অশোক, নন্তু, ভোলা, মোহিত, রঞ্জনের কথা। মনটার মধ্যে কেমন যেন হঠাৎ ছটফট করতে থাকে। দাঁড়িয়ে পড়ে লালু। অপলক দৃষ্টিতে দোতলার খোলা জানালা-পথে ক্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অন্ধ ভুলু তো অতশত বুঝতে পারে না। জিজ্ঞাসা করে, কি রে! দাঁড়ালি কেন হঠাৎ অমন করে? চল্!

প্রথমটায় হয়তো ভুলুর ডাক লালুর কানে পৌঁছয়ই না।

আবার ডাকে ভুলু, এই লালু! যাবি না?

অ্যাঁ! চমকে ওঠে লালু এবারে। বলে, কি?

দাঁড়ালি কেন? চল্?

বুক কাঁপিয়ে লালুর একটা দীর্ঘশ্বাস যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে। আবার সে কাঠের ক্রাচ দুটো বগলের নিচে দিয়ে খটখট করে পথ চলতে শুরু করে। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে আবার যেন

সারদানন্দ হাই স্কুলে গিয়ে ঢুকেছে। নবম শ্রেণীতে ও পড়ছিল। হেড পণ্ডিতের ধাতুরূপ-শব্দরূপের ক্লাসটা ওর কোনদিনই ভালো লাগত না। পিছনের বেঞ্চিতে বসে যত রাজ্যের দুষ্টুমি করেই ওর কাটত। কিন্তু সেদিন হেড পণ্ডিতের মুখে লতা শব্দের রূপটা যেন বাঁশির সুরের মতো তালে তালে বাজতে থাকে।

লতা লতে লতাঃ—

বিড়বিড় করে মনে মনে ঘুমের মধ্যেই বলতে শুরু করে, লতা লতে লতাঃ—

ভুলুর ঘুম ভেঙে যায়, সে লালুকে ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে বকতে শুনে ঠেলে জাগায়, এই লালু ? কি বিড়বিড় করছিস রে ?

লালু ঘুম ভেঙে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আবার পাশ ফিরে শোয় লজ্জায়।

ধাতুরূপ-শব্দরূপ কোনদিন তার ভালো লাগত না। সংস্কৃতকে অবহেলা করার জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে কত বকুনি, কত কানমলা খেয়েছে, কিন্তু আজ সেই ধাতুরূপ-শব্দরূপই যেন তাকে মন্ত্রের মতো টানতে থাকে নতুন এক অনাস্বাদিত মোহে, এমন কি ঘুমের মধ্যেও।

ঘুম আর হয় না। শুধু দু চোখের কোলে জল ভরে আসে। ব্যাকরণের সমস্ত ধাতুরূপ-শব্দরূপগুলো যেন চোখের সামনে বার বার রঙীন ছবির মতো ভেসে ওঠে।

দিন দুই পরে ফুটপাথে যেখানে পুরাতন বইগুলো সাজিয়ে লোকেরা বিক্রি করছে, সেখান দিয়ে যেতে যেতে লালু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

থরে থরে পাশাপাশি সাজানো বইগুলির মধ্যে রয়েছে তারই বড় পরিচিত একখানা বই—বেঙ্গলি সিলেকশন একখানা। ভুলুকে একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে গেল লালু। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করল; ঐ বইখানার দাম কত ভাই ?

লালুর কণ্ঠস্বর শুনে তার দিকে তাকায় দোকানদার।

একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, মলিন একটা হাফশার্ট ও হাফপ্যান্ট পরিধানে, বগলে কাঠের ক্রাচ।

তাচ্ছিল্যভরে দোকানদার চোখ ফিরিয়ে নিল। কোথাকার এক ভিখিরী না কে।

লালু আবার জিজ্ঞাসা করে, বলো না কত দাম!

যা, যা—ওই বই তোর কেনার ক্ষমতা নেই।

বলো না কত দাম?

দু টাকা। ভাগ এখান থেকে।

দাও বইখানা। বলে পকেট থেকে ভিক্ষার সঞ্চিত সযত্নে কাগজে মুড়ে রাখা এক টাকার পাঁচটি নোট থেকে দুখানি এক টাকার নোট এগিয়ে দিল, নাও টাকা। দাও বইটা।

দোকানদার একটু অবাকই হয় প্রথমটায়। পুরাতন বেঙ্গলি সিলেকশন, দাম এখন ওর একটা টাকাও নয়, রাগ করেই বলেছিল দু টাকা।

দাও। লালু আবার বলে।

দোকানদার এবার টাকা দুটো নিয়ে একটু বিস্মিত হয়েই বইটা তুলে দেয় লালুর হাতে।

বইটা সযত্নে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে লালু এগিয়ে যায় ভুলুর কাছে। রাত্রে রাস্তার ইলেকট্রিকের আলোতে বসে বইটা পড়ে। মনটা যেন আনন্দে ভরে যায়।

ভুলু লালুকে চুপ করে থাকতে দেখে শুধায়, কি রে চুপ করে আছিস যে?

পড়ছি। জবাব দেয় লালু।

কি পড়ছিস?

পড়ার বই।

শুনে ভুলু অবাক হয়ে যায়। বই পড়ছিস। পড়ার?

হ্যাঁ। শুনবি ?

পড়্!

লালু পড়ে চলে, ভুলু শোনে। একটার পর একটা :

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে,
হের ঐ ধনীর দুয়ারে, দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

একদিন ভুলু বলে, পরীক্ষা দে না কেন তুই লালু!

পরীক্ষা দেব ?

হ্যাঁ, পড়াশুনা কর। নিশ্চয়ই তুই পাস করবি।

কি যে বলিস! অত সব বই পাব কোথায় ?

কিনবি। আমাদের যা জমানো টাকা আছে তাই দিয়ে কেন্!

কিন্তু সে যে অনেক দাম রে!

তুই কিছু ভাবিস না লালু, দুজনে মিলে রোজগার করে কিনে ফেলব ঠিক, দেখিস।

॥ পাঁচ ॥

কিন্তু কিনব বললেই তো আর কেনা হয় না অত বই। অনেক টাকার প্রয়োজন। বইয়ের যে অনেক দাম। অবশেষে একদিন ভুলু বলে, একটা কাজ করলে হয় না লালু।

কি রে ?

রাজপুত্রের কাছে চাইলে কেমন হয় ?

রাজপুত্রের কাছে! কি চাইব ?

হ্যাঁ। চল—কাল চাইবি।

কিন্তু কি—চাইব কি ?

চল্ না! কাল সকালে বলব।

ভুলু অনেক ভেবে ভেবে ঠিকই করেছে, লালুর যখন এত লেখাপড়ার শখ, যেমন করে যেভাবেই হোক তার পড়াশুনার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। পড়াশুনায় ভুলু নিজে সত্যিই যাকে বলে ভালো ছেলেই ছিল। তাকে আর তার দিদি বীণাকে তাদের বাবাই বরাবর বাড়িতে নিজে পড়াতেন। বাবার সেই কথাটা আজও তার স্পষ্ট মনে পড়ে, বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে। কত আশা ছিল তার বাবার তার উপরে। তার বাবা নিজে উচ্চশিক্ষিত হয়েও টাকার লোভে সরকারী চাকরি না নিয়ে গ্রামের স্কুলের শিক্ষক-জীবনকে বরণ করে নিয়েছিলেন সামান্য মাইনেয়। সেই কারণে তার মায়ের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। বাবাকে উঠতে বসতে সেই কথা নিয়ে খোঁটা দিতেন মা। মেয়ে যখন বি. এ. পাস করে বাপের মতোই তার শিক্ষয়িত্রীর জীবন বেছে নেয়, মার প্রচুর আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু বীণা কান দেয় নি মার সেই আপত্তিতে। বাবা ঐ লাইন ভালোবাসেন জেনেই সে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছিল। নিজেও সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ত গ্রাম ছেড়ে আসবার আগে। শেষের দিকে অবিশ্যি চোখের দৃষ্টির ক্রমবর্ধিত স্বল্পতার জন্য তার পড়াশুনা বেশি করা হত না। কিন্তু বাবা তার সে দুঃখ মিটিয়ে দিতেন। তিনি পড়তেন, ভুলু শুনত। না, লালুকে যেমন করেই হোক পড়াতেই হবে।

পরের দিনই দুজনে গিয়ে লালবাড়ির পেছনের সরু গলিপথে শিস ও মাউথ অর্গানের ঐকতান শুরু করতেই সুরজিৎ জানালায় ছুটে এল।

বাজনা শেষ হয়ে গেলে ভুলু ডাকল, রাজপুত্তুর! আমাদের একটা উপকার করবে ভাই?

কি ভাই!

লালু পড়বে, পরীক্ষা দেবে!

সত্যি? লালু তুমি পড়তে জান?

হ্যাঁ।

এবারে বলে আবার ভুলুই, পড়তে হলে অনেক টাকার বইয়ের দরকার। কিন্তু আমাদের তো টাকা নেই। বই কিনতে পারছি না।

কত টাকার দরকার?

তা তো জানি না। তবে জিজ্ঞাসা করে এসে বলতে পারি।

বেশ, বোলো। দেখব-

পরের দিন ওরা এসে বলে প্রায় তিরিশ টাকার প্রয়োজন।

রাজপুত্তুর বলে, অত টাকা কোথায় পাব ভাই! তবে দিদিকে বলব। কাল এসো।

পরের দিন আসতে একটা পাঁচ টাকার নোট সুরজিৎ দেয় ওদের হাতে, এই এখন নাও ভাই। দিদি আর এখন দিতে পারল না। আমার কাছে তো টাকা থাকে না।

পাঁচ টাকা নিয়েই ওরা চলে আসে। মন বড় দমে যায়। লালু তো বেশ ভেঙেই পড়ে। কিন্তু ভুলু হঠাৎ বলে রাত্রে একসময়, তোর ভাবনা নেই লালু, টাকার যোগাড় আমি করব।

কি বলছিস পাগলের মতো? কোথায় পাবি টাকা?

ভাবছিস কেন তুই? দেখ না, এক মাসের মধ্যেই টাকার যোগাড় হয়ে যাবে। কাল থেকে আর তোর সঙ্গে শিস দেব না। তুই বাজাবি আর আমি—আমি গাইব গান।

গান গাইবি। তুই।

হ্যাঁ।

গান তুই গাইতে পারিস নাকি?

পারি।

তবে এতদিন এ কথা আমাকে বলিস নি কেন?

কি জবাব দেবে ভুলু তার বন্ধুর কথার? সত্যিই সে খুব ভালো গাইতে পারত, গলাও তার বাঁশির মতো সুরেলা ও মিষ্টি ছিল। কিন্তু নয় বছর বয়সের সময়ই তাকে একপ্রকার বাধ্য হয়ে গান গাওয়া

ছেড়ে দিতে হয়েছিল বিচক্ষণ এক ডাক্তারের পরামর্শে। ছোট-বেলায় গান গাইতে গাইতে একবার তার গলার পর্দা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা তাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন, ডাক্তার দেখান। স্বর একেবারে বসে গিয়েছিল, অনেক চিকিৎসায় গলার স্বর আবার সে ফিরে পায়। এবং তখুনি ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর কখনো যেন সে গলাকে স্ট্রেন না করে, যেন গান কখনও আর না গায়। সেই থেকেই বলতে গেলে গান তার বন্ধ গত পাঁচ বৎসর। তবু মনের তাগিদেই মধ্যে মধ্যে সে বাড়ির সকলকে লুকিয়ে নিচু গলায় গুনগুন করে গান গাইত। সে অভ্যাস আজও তার যায় নি।

যা হোক সত্যি সত্যিই পরের দিন থেকে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে সন্ধ্যেবেলা ভুলু গান গাইতে শুরু করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে লালু তাকে মাউথ অর্গান বাজিয়ে অনুসরণ করতে লাগল। অদ্ভুত মিষ্টি গলা ভুলুর, দেখতে দেখতে মুগ্ধ শ্রোতার ভিড়ে জায়গাটা ভরে যায়; এবং এক রাত্রেই দু ঘণ্টায় অভাবিতভাবে প্রায় আট টাকা ওরা রোজগার করে। দশ দিনে ওদের প্রায় পঞ্চাশ টাকা জমে গেল, বেলেঘাটা অঞ্চলে এক বস্তিতে ওরা একটা ছোট ঘর ভাড়া নিল। লালু স্কুলে ভর্তি হল। সন্ধ্যার দিকে স্কুল থেকে ফিরে প্রথম প্রথম দুজনাই ফুটপাথের ধারে গিয়ে বসে মাউথ অর্গানের সঙ্গে গান শুরু করত। কিন্তু ভুলু একদিন বললে, এবার থেকে আমি একা একাই গান গেয়ে যা পাই রোজগার করব। তুই আমাকে রাস্তার ধারে বসিয়ে দিয়ে এসে পড়াশুনা করবি। তারপর রাত নটায় গিয়ে নিয়ে আসবি, কেমন ?

প্রথমটায় লালু কিছুতেই বন্ধুর প্রস্তাবে রাজী হয় না। শেষে ভুলুর জিদে পড়ে বাধ্য হয়েই ভুলুর প্রস্তাব তাকে মেনে নিতে হয়। এবং ভুলুর ব্যবস্থামতই ভুলুকে লালু বসিয়ে দিয়ে চলে আসে।

তারপর রাত নটায় গিয়ে নিয়ে আসে প্রতিদিন।

রোজগার গড়ে ভালোই হয়।

লালুর কিন্তু কেমন লাগে। বলে, কাজটা ভালো হচ্ছে না ভুলু।

তুই থাম তো, যা করছিস কর্। পাস করে জলপানি পাওয়া চাই, মনে থাকে যেন। তুই মানুষ হলে আর তো আমাদের দুঃখ থাকবে না রে।

কিন্তু, তবু লালু ইতস্তত করে।

না, না, মন দিয়ে পড়াশুনা কর্, টাকা-পয়সার কথা তোর ভাবতে হবে না, বুঝলি ?

॥ ছয় ॥

যখন নিশ্চিন্ত মনে পড়বার সুযোগ ছিল, তখন লালুর পড়াশুনায় আদপেই মন বসত না। মনে পড়ে নিজের মাকে আজ, প্রদীপের আলোয় বই খুলে পড়তে বসলেই। পড়াশুনোয় ওর মন ছিল না বলে ওকে মা বলতেন, পড়াশুনো করে তুমি মানুষ হবে, লোকে আমাকে দেখিয়ে বলবে ঐ ললিতের মা। গর্বে আনন্দে সেদিন আমার বুক ফুলে উঠবে। সামান্য প্রদীপের আলোয় ঘরের অনেকটা অংশই অন্ধকার থমথম করে। সেই অন্ধকারের মধ্যে ওর মনে হয় মা যেন এসে বসে আছেন তাঁর পড়ুয়া ছেলের দিকে তাকিয়ে। তারপর এতদিন—মা মারা যাবার পর, কেউ ওকে পড়বার কথা বলে নি। ও নিজেও পড়াশুনা মন দিয়ে করে নি যতদিন সে সুযোগ ছিল। কিন্তু আজ যখন সেই সুযোগ তাকে চেষ্টা করে অর্জন করতে হল, তখন যেন ও বুঝতে পেরেছে সমস্ত অন্তর দিয়ে এর সত্যিকারের মূল্য কতখানি।

সমস্ত মন লালু পড়াশুনোয় ঢেলে দেয়। তবু মনের মধ্যে কোথায়

যেন একটা অতৃপ্তি অদৃশ্য কাঁটার মতো খচখচ করে বিঁধতে থাকে। প্রদীপের আলোয় বসে পড়তে পড়তে যখনই মনে হয়, তাকে এই সুযোগটুকু দেবার জন্য তারই মতো এক অন্ধ কিশোর শহরের ফুট-পাথের একধারে বসে গান গেয়ে পয়সা উপার্জন করছে, তখন ও আনমনা হয়ে পড়ে। পর হতে পর, অনাত্মীয়ের চেয়েও অনাত্মীয় এক অন্ধ কিশোরের ভালোবাসা ও ত্যাগ যেন তার একাগ্র প্রচেষ্টা ও সাধনাকে অনেক নিচে নামিয়ে আনে। পরস্পর তারা পরস্পরের বন্ধু। এতদিন সুখ-দুঃখ-চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়ে তারা পরস্পরের ছিল একান্ত পাশাপাশি; কিন্তু আজ যেন লালু কিছুতেই আর তার এতদিনকার এত পরিচিত এত কাছের সঙ্গীর কোন নাগালই পায় না। অন্ধ ভুলু যেন তাকে ছাড়িয়ে অনেক—অনেক উঁচুতে চলে গিয়েছে হঠাৎ এই কদিনের মধ্যেই।

একে শীতকাল। তার উপরে কদিন থেকে প্রচণ্ড শীত পড়েছে। একটা ছেঁড়া চাদর গায়ে দিয়ে পথের ধারে বসে ভুলু গান গায়। সাড়ে সাতটার পর থেকেই পথিকের ভিড়টা যেন অনেকটা কমে গিয়েছে। গতকাল থেকেই তার মাথাটার মধ্যে টিপটিপ করছে। গায়েও ব্যথা। তবু ভুলু বন্ধুকে কোন কথা জানায় নি। বাৎসরিক পরীক্ষা লালুর সামনে। পরীক্ষার ফিস্ দিতে হবে, তাছাড়া ও জেনেছে প্রদীপের আলোয় ঘরে পড়তে ওর কষ্ট হয় বলে প্রায়ই বাইরে গিয়ে রাস্তার আলোয় বসে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে। ভুলু তাই ঠিক করেছে ছোট দেখে আজ একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন কিনবে। তাই বেশি কিছু রোজগার দরকার। আজকে অভাবিতভাবে মিলেও গিয়েছে বেশি কিছু। এক ভদ্রলোক সন্ধ্যার মুখে তার গান শুনে খুব খুশী হয়ে তাকে করকরে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে গিয়েছেন। ভুলু তাই আজ একটু আগেই গান থামিয়ে চুপটি করে রোজগারের টাকা-পয়সাগুলো কোঁচার খুঁটে বেঁধে, বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষা করছিল। লালু এল রাত সাড়ে আটটায়। এসেই ডাকল, ভুলু!

লালু এলি ভাই ?

হ্যাঁ, চল্‌।

ভুলু উঠে দাঁড়াল। চলতে চলতে বললে, একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে দাঁড়াস ভাই একটু।

স্টেশনারি দোকানের সামনে, কেন রে ?

দরকার আছে।

কি দরকার ?

চল না, দেখবি'খন।

একটু এগুতেই একটা আলো-ঝলমল বড় রকমের স্টেশনারি দোকান পড়ল।

এই তো সামনে দোকান। কি দরকার বল্‌। লালু প্রশ্ন করে ভুলুকে।

একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন দেখ—কত দাম চায় ?

লণ্ঠন! লণ্ঠন দিয়ে কি হবে ?

যা বলি দেখ্‌ না।

লালু দোকানে ঢুকে দর জিজ্ঞাসা করে জানল, দাম আড়াই টাকা। এসে ও বললে। কোঁচার খুঁট থেকে পাঁচ টাকার নোটটা বের করে লালুর হাতে দিয়ে ভুলু বললে, যা একটা লণ্ঠন কিনে আন।

কিন্তু লণ্ঠন দিয়ে আবার কি হবে ? ঘরে তো আমাদের প্রদীপ আছেই—মিথ্যে টাকা নষ্ট না করে……

হ্যাঁ। তা বই কি। প্রদীপ তো আছেই। প্রদীপের আলোয় সারাটা রাত পড়ে পড়ে আমার মতো চোখের মাথাটা খাও। অন্ধ না হলে আর চলছে না। না—যা, যা—একটা লণ্ঠন কিনে নিয়ে আয় তো।

স্তম্ভিত নির্বাক বিস্ময়ে ভুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে লালু কিছুক্ষণ। তারপর একসময় যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতোই হাত বাড়িয়ে বলে, দে, টাকা দে।

শুধু লণ্ঠনই নয়, পথের থেকে তেলও কিনে লণ্ঠনে ভরে নেওয়া হল।

বস্তির ঘরে এসে লালুকে দিয়ে ভুলু লণ্ঠনটা জ্বালাল।

বেশ আলো হয়েছে, না রে ? ভুলু শুধায়।

হ্যাঁ। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় লালু ওর মুখের দিকে চেয়ে। ভাষা-হীন অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে ভুলু গভীর প্রত্যাশায় তারই মুখের দিকে তখন।

এমন সময় ভূতোর মা এসে ঘরে ঢোকে। হাতে তার একটা প্যাকেট কাগজে মোড়া। বর্ষীয়সী কায়স্থের বিধবা। একই বস্তিতে ওদের পাশের ঘরেই থাকে। সেও সব খুইয়ে পাকিস্তান থেকে এসে ঐ বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে। গত মাস দুই ধরে ভূতোর মা-ই ওদের রেঁধে খাওয়ায়। একসঙ্গে রান্না করে। তিনজনে খায়। পেটের দায়ে অবস্থা-বিপাকে ভদ্রঘরের বিধবা হয়েও তাকে বাড়িতে বাড়িতে আজ ঝিয়ের কাজ করে পেট চালাতে হচ্ছে। অন্ধ আর খোঁড়া কিশোর দুটিকে ভূতোর মা সত্যিই সন্তানের মতো ভালবাসে। নতুন কেনা ঝকঝকে লণ্ঠন ঘরে জ্বলতে দেখে ভূতোর মা বলে, আরে বাবা! ছেলেরা যে আমার লণ্ঠন কিনেছে গো।

ভুলুই জবাব দেয়, হ্যাঁ মাসী। আমি অন্ধ মানুষ, আমার আলোই বা কি, অন্ধকারই বা কি! লালু রাত জেগে পড়াশুনো করে, একটা লণ্ঠন না হলে কি চলে ? তাই কিনে আনলাম। ভালো করি নি মাসী ?

তা বেশ করেছ। এই নাও তোমার জামা আর ধুতি। ভূতোর মা প্যাকেটটা ভুলুর হাতে এগিয়ে তুলে দেয়।

এনেছ! বেশ। দেখ্ তো লালু গায়ে দিয়ে জামাটা। গায়ে হয় কিনা তোর!

এসব কি ভুলু ? লালু এবারে যেন ক্ষেপে উঠে বলে, এরকম করলে যেদিকে দু চোখ যায় আমি চলে যাব।

তা যাবি নে! একটা অন্ধকে একা ফেলে চলে যাবি নে! সবাই গেছে, এখন তুই যাবি বৈকি। কান্নাভরা স্বরে ভুলু কথাগুলো বলে।

জামা আনতে দিয়েছিলি তা তোর জন্যেও একটা আনতে কি হয়েছিল ?

আমি আবার জামা দিয়ে কি করব ? পথের ধারে বসে গান গেয়ে ভিক্ষে করি। ভিখিরী। আর তুই স্কুলে যাস, দশজনের সঙ্গে মিশতে হয়। তোর ভিখিরীর মতো থাকলে কি চলে রে!

আবার তুই ভিক্ষে, ভিখিরী, ঐসব কথা বলছিস ভুলু ? নে, এসব গায়ে দেব না। ছুঁড়ে ফেলে দেয় জামা-কাপড় লালু, ভুলুর গায়ের উপর।

রাগ করিস নে ভাই, আর বলব না ওকথা।

না। কখনোই আমি ও জামা গায়ে দেব না। তোর জন্য আনিস নি কেন ?

খ্যাপামি করিস না লালু। বেশ তো- পাস করে চাকরি করে টাকা আন, তখন কত জামা দিবি দিস। তখন বাবুর মতো চুপটি করে বসে থাকব, আর তুই আমাকে খাওয়াবি পরাবি। কি বলো মাসী ?

মাসী আর কি জবাব দেবে তার চোখেও জল এসে যায়।

দুঃখ করিস নে লালু। আমার জীবন তো ব্যর্থ হয়েই গেছে! তুই মানুষ হবি, তোর মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব ভাই।

॥ সাত ॥

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় পাশাপাশি শোয় ওরা দুজনে। একসময় লালু বন্ধুকে ডাকে, ঘুমুলি ভুলু ?

না। কেন রে ?

কাল আমাদের স্কুলের ছুটি; তোকে সঙ্গে নিয়ে কাল সকালে এক জায়গায় যাব।

কোথায় ?

চোখের হাসপাতালে। আমাদের স্কুলে অসীম বলে একটি ছেলে পড়ে, তার বাবা মস্ত বড় চোখের ডাক্তার। অসীম একটা চিঠি দিয়ে দিয়েছে তার বাবার নামে। অসীমের বাবাকে দিয়ে তোর চোখটা একবার ভালো করে পরীক্ষা করাতে হবে। কত লোকের কত শত শক্ত চোখের অসুখ সেরে যায়, তোরও হয়তো সেরে যাবে।

করুণ হেসে ভুলু বলে, মিথ্যে কেন যাবি হাসপাতালে লালু, চোখের নার্ভ শুনেছি আমার শুকিয়ে গিয়েছে। একবার এখানকারই এক ডাক্তার বলেছিল। কোন কিছুই আর করবার নেই।

হ্যাঁ! তুই তো সব জেনে একেবারে বসে আছিস!

রাগ করছিস কেন ভাই? আমি জানি, কিছু আব হবে না।

কিন্তু মুখে ভুলু যতই বলুক কিছু হবে না, পরদিন সকালে লালুর সঙ্গে হাসপাতালে যেতে কিন্তু সে আপত্তি করে না। মনের মধ্যে কোথায় একটা ক্ষীণ আশা থেকে থেকে উঁকি দেয়, সত্যই যদি সে আবার তার দৃষ্টি ফিরে পায়! সেই ছোটবেলার চেনা জগৎটা! আলো, আকাশ, ফল, ফুল পাখি কতদিন হল যে তার চোখের পাতা থেকে একেবারে মুছে গেছে, সেগুলো আবার ফিরে দেখতে পায় তো কি আনন্দই না হয়!

দুরু দুরু বক্ষে ভুলু লালুর সঙ্গে চোখ দেখাবার হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়ায়। আই আউটডোব। চোখের অসুখের রোগীদের ভিড়ে একেবারে গিসগিস করছে।

লালুই এগিয়ে গিয়ে ভুলুব নামে একটা টিকিট লেখাল। এবং সুদর্শন তরুণ যে ডাক্তারটি আউটডোরের খাতায় নাম লিখছিল লালু তার হাতে অসীমের চিঠিটা তুলে দিল। উপরে নাম লেখা চিঠিটার: ডাঃ এন. এন. বসু, ডি. ও. এম এস., এফ. আর. সি. এস, (লণ্ডন)। কৌতূহলভরে ডাক্তারবাবু চিঠিটা খুলে পড়ে। চমৎকার মুক্তোর মতন হাতের লেখা।

'বাবা, আমার এক সহপাঠীর বন্ধুর চোখের অসুখ। তার চোখটা

দেখে দিও   ইতি তোমার অসীম।"

তরুণ ডাক্তার চিঠিটা ভুলুর আউটডোর টিকিটটার সঙ্গে পিন দিয়ে এঁটে দেন।

যথাসময়ের কিছু আগেই ভুলুর ডাক পড়ল। লালু ভুলুকে নিয়ে ডাক্তারের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এক সৌম্যমূর্তি সাহেবী পোশাক পরিহিত প্রৌঢ়। চোখে সোনার চশমা।

লালুর দিকে তাকিয়ে কৌতূহলভরে শুধালেন, এই চিঠি তুমি এনেছ?

হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু।

কি নাম তোমার খোকা?

আজ্ঞে, ললিত মোহন রায়।

অসীমের স্কুলে পড় তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কার অসুখ?

এই যে আমার বন্ধু ভুলুর।

ডাঃ বসু লালু ভুলুর চেহারা ও বেশভূষার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট ছাপ ওদের দেহে ও পোশাকে।

এগিয়ে এসো তো খোকা।

ভুলু এগিয়ে গেল।

হয়েছে কি তোমার চোখে, কি কষ্ট হয় বল তো?

দেখতে পাই না।

ডাঃ বসু অনেকক্ষণ ধরে ডার্ক রুমে ভুলুর চোখ পরীক্ষা করলেন, তারপর একসময় আড়ালে আলাদা করে লালুকে ডেকে বললেন, শোনো ললিত, তোমার বন্ধুর চোখের অবস্থা খুবই খারাপ।

ভাল হবার কি কোন আশা নেই ডাক্তারবাবু?

লালুর মুখের দিকে তাকিয়ে সত্য কথাটা বলতে ডাঃ বসুর কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকে এবং ডাক্তারদের ধর্মই হচ্ছে আশ্বাস দেওয়া। তাই তিনি বললেন, আশা একেবারেই যে নেই বলা যায় না। তবে চেষ্টা করে দেখব আমরা।

কি করতে হবে আমাকে বলুন ডাক্তারবাবু!

দুটো ওষুধ আমি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ওষুধের চাইতে পুষ্টিকর খাদ্যের বেশি দরকার তোমার বন্ধুর। কিন্তু সেসব কি যোগাড় করতে পারবে? তোমাদের আর কে আছে?

আমাদের?

হ্যাঁ।

আমাদের আমরা দুজন ছাড়া আর তো কেউ নেই!

কৌতূহল হয় ডাঃ বসুর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি লালুর ইতিহাস শোনেন। সব কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যান তিনি, সর্বস্ব খুইয়ে দুটি কিশোরের বেঁচে থাকবার এই সাধনা তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি নিজে টাকা দিয়ে ওষুধ তো কিনে দেনই—কিছু ফলও কিনে দেন এবং বলেন, ওষুধ ও ফল ফুরিয়ে গেলে আবার তাঁর কাছে আসতে।

কিন্তু ডাঃ বসু এত করলেও লালু বুঝতে পারে, তার বন্ধুর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার আশা খুবই কম।

পথে বের হয়ে ভুলু জিজ্ঞাসা করে, কি বললেন রে ডাক্তার-বাবু?

কি আর বলবেন, বললেন সেরে যাবে।

সত্যি? সত্যি এ কথা তিনি বলেছেন?

হ্যাঁ।

চল লালু, অনেকদিন রাজপুত্তুরের কাছে আমরা যাই না। তাকে গিয়ে গান শুনিয়ে আসি। যাবি?

চল।

দুজনে সেই লালবাড়ির দিকে চলতে থাকে।

কিন্তু লালবাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে লালু দেখে রাস্তার দুধারে সারি সারি সব গাড়ি দাঁড়িয়ে, চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। লালুর মনটা কেমন যেন ভয়-ভয় করতে থাকে একটা অজানিত আশঙ্কায়।

ও ভুলুকে দাঁড়াতে বলে গেটের দিকে ক্রাচে ভর দিয়ে ঠকঠক করে এগিয়ে যায়।

॥ আট ॥

লালু তার কাঠের ক্রাচে ভর দিয়ে ঠকঠক শব্দ তুলে লাল বাড়ির প্রকাণ্ড পাল্লাওয়ালা লোহার গেটটার দিকে এগিয়ে যায়। ও দেখতে পায় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে গেটটার দিকে এদিক-ওদিক লোকেরা যাতায়াত করছে, কারোরই ওর দিকে ফিরে তাকাবার যেন অবকাশ নেই। পোর্টিকোর নিচে কয়েকজন স্যুট-পরিহিত ভদ্রলোক নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করছেন যেন।

ঝোঁকের মাথায় পোর্টিকো পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে যায় লালু। চার ধাপ প্রশস্ত সিঁড়ি সামনেই উঠে গিয়েছে। সিঁড়ির দুপাশে টবে সিজন ফ্লাওয়ার ও বর্ণাঢ্য পাতাবাহারের গাছ। সামনে ড্রয়িংরুমের দরজায় ঝুলছে ঘন নীল রঙের একটা ভারী পর্দা। জানালায় জানালায় জাফরানী রঙের নেটের পর্দা। ঘরের অভ্যন্তর দৃষ্টির অগোচর। পরনে সাদা ধোপদুরস্ত ধুতি, গায়ে তদ্রূপ ফতুয়া ও কাঁধের উপরে একটা তোয়ালে, শুভ্রকেশ প্রৌঢ় পুরাতন ভৃত্য সুরেন হাতে একটা কাগজ নিয়ে ড্রয়িংরুমের পর্দা তুলে বের হয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে সামনে এগুতেই দণ্ডায়মান লালুকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল, কি চাস রে?

সুরেন ইতিপূর্বে লালু ভুলুকে দেখেছেও এবং চেনে। অন্যমনস্ক

লালু প্রথমটায় সুরেনকে দেখতে পায়নি. এখন তার গলার স্বরে চমকে ওর মুখের দিকে তাকাল।

সুরেন জানত ঐ খোঁড়া লালু ও তার সঙ্গী কানা ছেলেটা এসে প্রায়ই খোকাবাবুকে গান শুনিয়ে যায়। আজও হয়তো গান শোনাতেই এসেছে ভেবে বললে, খোকাবাবুর বড্ড অসুখ রে। আজ তো আর গান শোনাতে পারবি না, যা।

কার অসুখ? রাজপুত্তুরের? প্রশ্ন করলে লালু।

হ্যাঁ। আজ চার-পাঁচদিন থেকে প্রায়ই রক্ত পড়ছে মুখ দিয়ে।

রক্ত পড়ছে! চমকে ওঠে লালু।

ওদিকে তখন সেই লালবাড়ির দোতলার দক্ষিণের প্রশস্ত ঘরে রোগক্লিষ্ট সুরজিৎ দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে শুয়ে চোখ বুজে আছে। মুখখানি তার শুকিয়ে আরো ছোট হয়ে গিয়েছে। মাথার থোকা থোকা রেশমের মতো চুলগুলো দীর্ঘ দিন ধরে রোগে ভুগে ভুগে পাতলা হয়ে গিয়েছে। গায়ের উপরে একটা কাশ্মিরী লালরঙের কম্বল। সুরজিতের শিয়রের ধারে বসে ওর বিধবা দিদি মণিকা।

মণিকা সুরজিতের পশমের মতো নরম চুলে হাত বোলাচ্ছে। বাঁদিকে একটা বড় টেবিলের উপরে নানাবিধ ওষুধের শিশি, ফল, ফিডিং কাপ ইত্যাদি।

দিদিমণি! চোখ মেলে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল সুরজিৎ।

চোখের মণি দুটো এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় যেন চকচক করছে।

রোগতপ্ত রোগশীর্ণ কপালে ঠাণ্ডা হাতটি রেখে মণিকা শুধাল, কেন মন্নু ভাই?

সুরজিতের ডাকনাম মন্নু।

বিখ্যাত জমিদার ও মার্চেণ্ট বিশ্বম্ভর চৌধুরীর আগের পক্ষের সন্তান ঐ দুটি।

মেয়ে মণিকা আর ছেলে সুরজিৎ (মন্নু)।

বহু অর্থব্যয় করে, ভালো পাত্রের সঙ্গে বিশ্বম্ভর চৌধুরী মণিকার বিবাহ দিয়েছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্য মণিকার, বিবাহের বৎসরখানেক পরেই ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে আকস্মিক মৃত্যু ঘটে মণিকার স্বামী বিমলকুমারের।

মণিকা সেই থেকে বাপের কাছেই থাকে এবং কলেজে পড়ে। পড়াশুনা ও মা-হারা রুগ্ন ভাইটিকে নিয়ে তার দিন কেটে যায়।

বছর দুই হল কালব্যাধি এসে সুরজিতের কচি বুকে বাসা বেঁধেছে।

অকাতরে অর্থব্যয় করছেন বিশ্বম্ভরবাবু পুত্রের চিকিৎসার জন্য, কিন্তু বিশেষ কোন ফলই পাওয়া যায় নি।

গত মাসখানেক ধরে রোগ যেন মন্দের দিকেই চলেছে। বড় বড় ডাক্তাররাও এখন হতাশ হয়ে পড়েছেন।

দিদিমণি? সুরজিৎ আবার ডাকে।

কেন মনু ভাই!

ওরা আর আসে নি, না?

কারা? তোমার সেই বন্ধুরা?

মণিকা জানে সেই পথের দুই কিশোর লালু ভুলুর কথা।

মণিকা বলে, কই, তাদের তো অনেকদিন আসতে দেখি না।

নিশ্চয়ই তারা এসেছে দিদিমণি। আমাকে দেখতে না পেয়ে হয়তো ফিরে গিয়েছে। পড়বার বই কেনবার জন্য ওরা টাকা চেয়েছিল আমার কাছে। ওরা বড় গরীব, বই তো কিনতে পারে না। পাঁচটা টাকায় আর কি বই কিনতে পারবে?

বেশ তো। তার জন্য দুঃখ করো না মনু! এবারে এলে কিছু বেশি টাকা দিয়ে দেব তোমার নাম করে।

তারা কারো কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নেয় না দিদিমণি! তোমার কাছ থেকেও তারা টাকা নেবে না!

তোমার নাম করে দেব।

তাদের তুমি জান না দিদিমণি। নেবে না। ওরা তো ভিক্ষুক নয়! রাস্তায় তোমরা যাদের ভিক্ষে করতে দেখ ওরা তাদের কেউ নয়। একটা কাজ করবে দিদিমণি?

কি মনু!

আমি তাদের নামে একটা চিঠি লিখে রাখব। এবারে বাবা আমাকে জন্মদিনে যে সোনার মোহরটা দিয়েছেন, ওরা যদি কখনো এদিকে আসে, সেই চিঠিটা আর মোহরটা ওদের দিও আমার কথা বলে।

ছোট ভাইয়ের কথায় মণিকার চোখে জল এসে যায়। কোনমতে উদ্গত অশ্রুকে গোপন করে ধরা গলায় বলে, চিঠি কেন? তুমি নিজের হাতে দিও।

নিজের হাতে দেব? কিন্তু আর কি তাদের সঙ্গে দে

কেন দেখা হবে না? নিশ্চয়ই হবে।

না দিদিমণি, আমি বুঝতে পারছি আর তাদের হবে না।

ঠিক এমনি সময় দূর থেকে অস্পষ্ট মিষ্টি একটা ভেসে এল।

ওগো সোনার দেশের রাজার কুমার,
শুনতে কি গো পাও,
পথিক ছেলে বাজায় বাঁশি,
সুরটি তুলে লও।

চমকে ওঠে সুরজিৎ। কে! কে গান গায়! দেখো! দেখো না দিদিমণি, কে গান গায়!

ব্যস্ত হয়ো না মনু। দেখছি। আমি এখুনি দেখছি।

মণিকা তাড়াতাড়ি উঠে বাইরের বারান্দায় যায়। গানের সুর অনুসরণ করে মনে হয় পিছনের গলি থেকেই আসছে সেই মিষ্টি গানের সুর।

নিচের ঘরে গিয়ে গলির জানালা খুলতেই চোখে পড়ে, খোঁড়া লালু মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে আর গান গাইছে অন্ধ ভুলু।

॥ নয় ॥

মণিকা দেখে নির্জন গলির মধ্যে সেই অন্ধ ও খোঁড়া কিশোর দুটি. একজন বাঁশির মতোই মিষ্টি গলায় গাইছে গান, অন্যজন তার সেই গানের সঙ্গে মিলিয়ে মাউথ অর্গান বাজিয়ে চলেছে আপন মনে।

ধনীর দুলালী মণিকা। জ্ঞান হওয়া অবধি অফুরন্ত স্নেহ-মমতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে যার প্রতিটি দিন কেটেছে, দুহাতে ফেলে ছড়িয়ে প্রাসাদের আভিজাত্যে যে অভ্যস্ত, এমনি করে আজকের মতো অবহেলিত পথের ওপরে দৃষ্টি দেবার কোন দিনই তো সুযোগ ঘটে নি এর আগে তার। এ যেন সেই মস্ত উঁচু সাতমহলা প্রাসাদের জানালা থেকে রাজকন্যার শোনা, দূর দূরান্ত থেকে ভেসে আসা রাখাল ছেলের মেঠো বাঁশির সুর। মনকে মুহূর্তে যেন কেড়ে নেয়। অদ্ভুত এক আকর্ষণে যেন সম্মোহিত করে ফেলে। চিরদিনের পরিচিত প্রাসাদ-আভিজাত্যের বাইরেও যে প্রাণের স্পন্দন জাগে, সেখানেও যে সুখ-দুঃখের কাঁপন জাগে, আজ যেন নতুন করে সর্বপ্রথম টের পায় সেটাই মণিকা।

ঐ কিশোর দুটির উপরে ছোট ভাই মনুর আকর্ষণকে মণিকা ইতিপূর্বে কোনদিনই ভালো চক্ষে দেখতে পারে নি; তার জন্মগত আভিজাত্যের অহমিকা তাকে শাসন করেছে, কিন্তু রুগ্ন ভাইটির মনে ব্যথা লাগবে বলে মুখে কখনো কিছু বলে নি।

চারপাশে প্রাচীর ঘেরা মহল আর বাইরের অবারিত রাজপথের সঙ্গে যে চিরদিনের পার্থক্য, যে ব্যবধান—তাকে ডিঙিয়ে যাওয়া তো সহজ কথা নয়। সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন গোষ্ঠী, একেবারে পৃথক দুই

জগৎ। একের ঘর-দুয়ার, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, সমাজ, চাল-চলন এমন কি আহার্য পর্যন্ত অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তবু আশ্চর্য—মহলে যারা বাস করে তারাও মানুষ. তাদেরও হাত-পা আছে, তাদেরও ক্ষুধা পায়, ঘুম আসে, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা বোধ আছে। এবং যারা পথের তারাও মানুষ, তাদেরও ওদেরই মতো সব প্রকার ভালোমন্দ বোধ আছে। তবু কেন এই পার্থক্য। কেন তাদের সঙ্গে সমান ভেবে কথা বলতে, ঘরে এনে বসাতে মণিকার মন সাড়া দেয় না!

মণিকা তো জানে, মনু, তার ভাইটি কত ভালবাসে ওদের, ঐ দুটি পথের কিশোরকে। এবং রোগশয্যায় শুয়েও ওদের প্রতীক্ষায় কান পেতে রয়েছে। ওদের দুজনকে সামনে দেখতে পেলে মনু কত খুশী হবে মণিকা জানে। তবু মণিকা পারে না কেন ওদের ভিতরে ডাকতে!

ওদিকে মনুর কানেও ওদের গানের ও বাজনার সুর গিয়ে পৌঁছতেই ছটফট করতে থাকে মনে মনে। কতদিন ওর দুটি কিশোর বন্ধুকে দেখে না ও।

ঘরের চারপাশে একবার চেয়ে দেখে নিল। কেউ নেই ঘরে। ঘর খালি। দিদি নেই, নার্সও নেই, সৎমা তো এঘরে আসেনই না। তাঁর নিজের ছেলেকে নিয়েই তিনি ব্যস্ত। পাছে সেই ছেলের মনুর রোগের ছোঁয়া লাগে তাই তিনি বড় সতর্ক। এ ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়ান না। বাবাও হয়তো নিচে কোথাও ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শে ব্যস্ত।

লালু ভুলু এসেছে। গলিতে তারা মাউথ অর্গান বাজিয়ে গান করছে। একটিবার যদি ও নিচের ঘরে গিয়ে গলির দিককার জানালাটা খুলে ওদের দেখে আসে কেউ নিশ্চয়ই টের পাবে না। একবার গিয়ে দেখেই ও চলে আসবে। সুরজিৎ ধীরে ধীরে বিছানার উপরে উঠে বসল। কয়েকদিন আগে মাথার বালিশের নিচে ছোট

একটা সাদা হাতির দাঁতের বাক্স লুকিয়ে রেখেছিল। সেটা বালিশের তলা থেকে বের করল। বাক্সটার মধ্যে ছিল জন্মদিনে বাবার কাছ থেকে পাওয়া সোনার চকচকে বাদশাহী মোহরটা। মোহরটা ডান হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে পড়ল মনু। দীর্ঘ কুড়ি দিন বাদে আজই সবপ্রথম সুরজিৎ শয্যা থেকে নেমে শ্বেত পাথরের মেঝেতে পা রাখল।

ডাক্তারের কঠিন নির্দেশ—বিছানা থেকে একদম নামা হবে না। কিন্তু ঐ মুহূর্তে যেন সব ভুলে যায় সুরজিৎ। রোগজীর্ণ দুর্বল দীর্ঘ অনভ্যস্ত পা দুটো যেন মেঝের উপরে দাঁড় করানো যাচ্ছে না কোন-মতেই। কাঁপছে। থরথর করে কাঁপছে। শুধু পা দুটোই নয়, সমস্ত শরীরটাও কাঁপছে সেই সঙ্গে. মাথাটার মধ্যেও কেমন যেন ফাকা ফাঁকা লাগছে। কিন্তু থামলে তো চলবে না! নিচে যে তাকে যেতেই হবে। লালু ভুলু এসেছে, একটিবার তাদের সঙ্গে যে দেখা তাকে করতেই হবে। তাদের যে ওর বড় দরকার। দুর্বল পায়ে কোনমতে থেমে থেমে টলতে টলতে ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সুরজিৎ।

সুরজিতের আদরের প্রিয় ঝুঁটিওয়ালা সাদা কাকাতুয়াটা আজ অনেকদিন পর সুরজিৎকে বারান্দায় দেখে খুশীতে ডেকে ওঠে, মনু। মনু—মনু!...

সন্তর্পণে ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে সুরজিৎ বলে চাপা কণ্ঠে, এই দুষ্টু, চুপ! চুপ!

বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলে সুরজিৎ। কিন্তু শরীর তো চলতে চাইছে না। বুকটার মধ্যে কেমন যেন একটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ঝিমঝিম করছে। না। তবু—তবু যেতে তাকে হবেই।

গান আর বাজনা শোনা যাচ্ছে লালু আর ভুলুর। তারা যে গানের সুরের ভিতর দিয়ে তাকে ডাকছে! সে কি না গিয়ে পারে! কতদিন ও দেখে নি তাদের। তা ছাড়া মোহরটা ওদের যে দিতে

হবে। আহা! বড় গরীব ওরা। ওদের কত কষ্ট!....অন্ধ আর খোঁড়া! সুরজিৎ এগিয়ে চলে কাঁপতে কাঁপতে, টলতে টলতে দুর্বল অশক্ত পায়ে পায়ে। শেষ সিঁড়ির ধাপে যখন সুরজিৎ এসে পৌঁছল, দৃষ্টি যেন কেমন অস্পষ্ট ঝাপসা মনে হয়। বুকের মধ্যে যেন একটা চাপা ব্যথা অনুভব করে, গলার মধ্যে সড়সড় করে ওঠে, তারপরই উষ্ণ তরল পদার্থ বের হয়ে আসে খানিকটা গলা দিয়ে।

ছলকে বুকের উপর এসে পড়ল কি যেন!

সাদা জামাটা বুকের কাছে লাল হয়ে উঠল। একঝলক তাজা রক্ত! শুধু মুখ দিয়েই নয়, নাক দিয়েও সড়সড় করে দুফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। চলতে চলতেই জামার হাতায় মুছে নেয় নাকটা সুরজিৎ। তবু সে থামে না, চলে ঘরের দিকে। কিন্তু আর যে পারছে না সুরজিৎ। সব যে সামনে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। এ কি হল! আলো কি নিভে যাচ্ছে সব! ঘরের মধ্যে চোখের সামনে যে ঝকঝকে সূর্যের আলো ছিল চোখ-ঝলসানো, সে আলো কি সব মুছে গেল চোখের পাতা থেকে! পৃথিবীতে কি আর আলো নেই! এত অন্ধকার কোথা থেকে এল! শুধু সেই নিকষ কালো অন্ধকার সমুদ্রে কে যেন মুঠো মুঠো লাল পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছে, কোথাও কোনও শব্দ নেই, কেবল মিষ্টি একটা ক্ষীণ গানের সুর ভেসে আসছে দূর—বহুদূর হতে।

লালু ভুলু কি এখনও গান গাইছে! কোনমতে টলতে টলতে নিচের সেই ঘরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুরজিৎ। আচমকা সেই শব্দে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল মণিকা। ও কি! মন্নু! মন্নু! তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে মণিকা, মন্নু! মন্নু ভাই! তারপর ছুটে এসে ভূপতিত সুরজিতের নেতিয়ে-পড়া রক্তমাখা মুখটা দুহাতে তুলে ধরে মণিকা। রক্তমাখা ঠোঁট দুটি যেন রক্তগোলাপের দুটি পাপড়ি! থরথর করে কাঁপছে তখনো।

মণিকা আবার চিৎকার করে উঠল, বাবা, ডাক্তার সেন,

শীগগির আসুন।

মণিকার চিৎকারে হন্তদন্ত হয়ে সকলে মুহূর্তে সেই ঘরে ছুটে আসেন। সুরজিতের রক্তমাখা মুখখানা মণিকার দুই হাতের মধ্যে মনে হয় যেন একথোকা রক্তগোলাপ। সুরজিতের শিথিল মুষ্টি থেকে সোনার মোহরটা গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে আছে এক কোণে।

॥ দশ ॥

সুরজিৎ যেন একটা অদ্ভুত আঘাতে মণিকার মনটাকে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। তার জীবনের চব্বিশ বছরের সংস্কার, দৃষ্টিভঙ্গী ভেঙেচুরে যেন তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে। আচমকা যেন তার এতদিনকার চেনা মহলের খোলা জানালা-পথে অনভ্যস্ত অপরিচিত একটা শক্তি প্রখর চোখ-ঝলসানো আলোর ঝাপটা ঘরের মধ্যে এসে তার দু চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

আজকাল যেন কেবলই মনুর শেষদিনের কথাগুলো মণিকার মনে পড়ে বার বার।

আভিজাত্য ও সংস্কারের ছাপ পড়ে নি মনের মধ্যে তার তখনও তাই হয়তো মনু অত সহজেই পথের কিশোর দুটিকে এনে আপন হৃদয়ের আসনটি পেতে আপন করে নিতে পেরেছিল। প্রতিদিনের রুটিন-বাঁধা কাজের মধ্যে মণিকা কিছুতেই নিজেকে যেন আগেকার মতো আর ডুবিয়ে রাখতে পারে না। কেবল মনের মধ্যে পাশাপাশি দুটি ছবি ভেসে ওঠে, রক্তগোলাপ-ঢাকা একখানি মুখ আর তারই পাশে ভেসে ওঠে আর দুটি পথের কিশোরের করুণ মলিন মুখ।

রক্তমাখা সেই সোনার বাদশাহী মোহরটাও যত্ন করে রেখে দিয়েছে মণিকা।

"ভাইয়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে, সেই মোহরটি লালু ভুলুকে

দিতে হবে।

শেষবারের মতো গাড়িতে চেপে মনুর ফুলে-ঢাকা শবদেহের পিছু পিছু যেতে দেখেছিল মণিকা লালু ভুলুকে সেদিন। নিঃশব্দে মূর্তিমান শোকের মতো যেন ধীর মন্থর পদে একজন এবং অন্যজন কাঠের ক্রাচ বগলে শবযাত্রার সবশেষে একেবারে শ্মশানঘাট পর্যন্ত গিয়েছিল।

নিঃশব্দেই সেই অন্ধ ও খোঁড়া কিশোর দুটি যতক্ষণ না শবদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সবার ভিড় বাঁচিয়ে দূরে, একটি পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল যেন পথের শেষ তীর্থযাত্রীর মতো।

শেষকৃত্য সেরে ওরা যখন ফিরে আসে, তখন আর দেখতে পায় নি তাদের; এবং তারপর থেকে কলেজে যাবার আসবার পথে বৃথাই মণিকার অনুসন্ধানী দৃষ্টি কতবার এদিক-ওদিক খুঁজে ফিরেছে সেই কিশোর দুটিকে। দেখতে আর পায় নি। কিন্তু যেমন করেই হোক খুঁজে যে তাদের বের করতে হবে মণিকার। মনুর শেষ ইচ্ছাটুকু যে তাকেই পূরণ করতে হবে।

সেদিন কলেজ ফেরত এক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে গাড়ি ফিরিয়ে দিল মণিকা। হেঁটেই সে বাড়ি ফিরবে। আজকাল মধ্যে মধ্যে এমনি করে সে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে। জ্ঞান হওয়া অবধি কখনও এতটা বয়স পর্যন্ত সে এমনি করে শহরে রাস্তা দিয়ে হাঁটে নি। চলমান গাড়ির নরম গদিতে হেলান দিয়ে বসে দুপাশের রাস্তা ও জনপ্রবাহের সামান্য সামান্য যে ভগ্নাংশ তার চোখে পড়েছে সেটা তার মনের চিরন্তন সংস্কারকে নাড়া দিতে পারে নি, তেমনি ছুঁতে পারে নি তার মনের নিভৃত স্থানটি। মানুষের জীবন ও পরিচয়ের কত দিক যে কত ভাবে ছড়িয়ে আছে, রাস্তা দিয়ে সকলের পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে আজ নূতন করে সে সত্যটি হঠাৎ যেন সে জানতে পারল। শুধু তারা এবং তাদের জাতই নয়, আরও জাতের যে মানুষ আছে, এ যে কত বড় একটা জানা, এ যেন ও বুঝতে পেরে বিস্ময়ে

অবাক হয়ে গিয়েছিল। আনন্দ যে কতরূপে কত ভাবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, জানতে পেরে নিজে যেন সে সত্যিই অভিভূত হয়ে গিয়েছে।

আলোকিত জনকোলাহল-মুখরিত ফুটপাথের ভিড় সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা পরিচিত কিশোর-কণ্ঠের মিষ্টি গানের সুর কানে এসে লাগতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল মণিকা।

ফুটপাথের একধারে লোক জমে গিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কোনমতে উঁকি দিল মণিকা। গাইছে সত্যিই সেই অন্ধ ভুলু।

গানের ভাষা বলছে, হে দয়াল প্রভু! তুমি আমার দু চোখের আলো কেড়ে নিয়েছ বলেই কি আজ তুমি আমার এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছ। তাই কি দু চোখের অন্ধকারের সমুদ্রে দেখতে পাচ্ছি কেবলই তোমার জ্যোতির্ময় রূপের আনন্দময় বিকাশ।

তন্ময় হয়ে শুনল মণিকা অন্ধ ভুলুর গান। গানের শেষে একে একে সব চলে গেছে, যার যেমন খুশী দুটো চারটে করে পয়সা দিয়ে গিয়েছে সামনের ফুটপাথে বিস্তৃত গামছাটার উপরে। ভুলু সেগুলো হাতড়ে হাতড়ে কুড়োচ্ছিল। একটা আনি গড়িয়ে ভুলুর নাগালের বাইরে একটু দূরে পড়েছিল, মণিকা সেটি নিচু হয়ে কুড়িয়ে তার হাতে দিতে দিতে বলে, এই নাও আর একটা আনি।

ভুলু আনিটা হাত পেতে নিয়ে বলে, ধন্যবাদ।

তোমার নাম ভুলু না ভাই।

চমকে ওঠে ভুলু, মিষ্টি-দরদী একটি মেয়েলী কণ্ঠস্বরে নিজের নাম শুনে।

মণিকা এবার একটু ইতস্তত করেই আবার ডাকে, ভুলু

কে? চমকে ওঠে ভুলু।

আজ যে তুমি একা! তোমার সই বন্ধুটি কোথায় ভুলু!

আপনি কি আমাদের চেনেন?

হ্যাঁ।

সে এখন স্কুলে ভর্তি হয়েছে, পড়াশুনা করছে কিনা, তাই একাই

আমি আসি গান গাইতে।

এমন সময় খটখট শব্দ তুলে খোঁড়া লালু এসে হাজির হয় সেখানে। সেই শব্দে ভুলু প্রশ্ন করে, লালু এলি ?

হ্যাঁ। চল—

লালুর ডাকে ভুলু উঠে দাঁড়ায়। লালু কিন্তু একবারের জন্যও মণিকার দিকে ফিরে তাকায় না। মণিকা যে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ও যেন দেখেও দেখে না। দেখতে বুঝি চায় না! লালুর কাঁধে ভর দিয়ে ভুলু এগিয়ে যাচ্ছিল। মণিকার ডাকে দুজনেই হঠাৎ থমকে ফিরে দাঁড়ায়, শোনো!

মণিকা বলে, তোমরাই তো মন্নুকে গান শোনাতে যেতে, তাই না ?

মন্নু! মন্নু কে ? লালু প্রশ্ন করে এবার যেন একটা কৌতূহলেই।

সেই যে লালবাড়ির সুন্দরমত ছেলেটি ছিল।

কে! আমাদের রাজপুত্তুরের কথা বলছেন ? এবারে কথা বলে ভুলু।

রাজপুত্তুর! মণিকা যেন একটু বিচলিতই হয়।

কিন্তু সে তো—, ভুলু কথাটা শেষ করতে পারে না।

বুঝতে পারে এবার ব্যাপারটা মণিকা।

মৃদু কণ্ঠে বলে, না! সে নেই, কিন্তু আমি তো আছি। তার দিদি। আমাকে তোমরা গান শোনাবে না ভাই ?

আপনি—আপনি আমাদের গান শুনবেন ? বিস্মিত ভুলু এবারে প্রশ্ন করে।

শুনব বৈকি। মন্নু যেমন তোমাদের ভালোবাসত, আমিও তোমাদের ভালোবাসব। তোমাদের গান শুনব। আসবে তো আমার কাছে ?

না! লালু জবাব দেয়।

আসবে না! কেন ?

আপনারা বড়লোক, আমরা গরীব সেখানে আমরা গিয়ে কি করব? বলেই ভুলুর দিকে ফিরে লালু বলে, চল ভুলু।

মণিকা ব্যস্ত হয়ে ডাকে, শোনো! শোনো!

না। ক্ষমা করবেন। আমরা যেতে পারব না। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। লালু আবার বলে।

কিন্তু আমি নিজে যদি তোমাদের ওখানে যাই! মণিকা বলে।

কি বলছেন আপনি! বস্তিতে কি কখনও গিয়েছেন আপনারা! লালু প্রতিবাদ জানায়।

এমন সময় হঠাৎ ভুলু বলে ওঠে, আপনি, আপনি রাজপুত্তুরের দিদি? নিশ্চয়ই তাহলে আপনাকে গান শোনাব! তবে আপনার আমাদের ওখানে আসতে হবে না! সময় করে আমরাই যাব।

আসবে! সত্যি বলছ আসবে ভুলু!

হ্যাঁ, যাব! ভুলু জবাব দেয়।

॥ এগারো ॥

লালু কিন্তু ভুলুর কথা দেওয়ার ব্যাপারে যেন একেবারে খেপে যায়। বলে, গান শোনাবার আর লোক পেল না ভুলু! ঐ অহঙ্কারী বড়লোকগুলোকে কোন্ দুঃখে তারা গান শোনাতে যাবে! প্রথম যেদিন গৃহহীন হয়ে ক্ষিদের জ্বালায় মাউথ অর্গান বাজিয়ে পথচারীর কৃপাভিক্ষার জন্য হাত পেতে দাঁড়াতে হয়েছিল লালুকে, প্রকৃতপক্ষে সেইদিন থেকেই ঐসব সুখী স্বচ্ছন্দ আহারপুষ্ট বড়লোকদের প্রতি একটা ঘৃণার বাষ্প তার কচি কিশোর মনে জমে উঠতে আরম্ভ করে। এবং যত দিন যেতে থাকে পথের কষ্ট ও দুঃখ সেই বিষ বাষ্পকে যেন ঘন ও জমাট করে তুলতে থাকে। এমনি করেই অবস্থা-দুর্বিপাকে ও সামাজিক অসামঞ্জস্য ও অব্যবস্থায় কত সুন্দর

নিষ্পাপ কিশোর মনের মধ্যে পাপ ও দুষ্কৃতির বীজ রোপিত হয়, কতজনাই বা তার খবর রাখে। এত বড় দেশের মধ্যে একা কিশোর তো ঐ লালুই নয়। কত শত কিশোরের সে তো সামান্য একটু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। ক্রমে সেই বিষবাষ্প আরো বিষিয়ে উঠতে থাকে যখন লালু গিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়। জন্ম-পরিচয় তার যাই থাক না কেন, সমাজবহির্ভূত এক অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশ থেকে লালু এসেছে এ সংবাদটা বেশীদিন তার সহপাঠীদের কাছে গোপন থাকে নি। ফলে দু-এক মাস না যেতে যেতেই তার সহপাঠীদের মধ্যে ফিসফিস কানাকানি শুরু হয়। তথাকথিত ভদ্রঘরের অন্যান্য সহপাঠীরা ক্লাসে লালুকে ঠিক তাদের সমগোত্রীয় বলে মেনে নিতে পারে নি। স্কুলের নিয়মে বাধ্য হয়ে সকলের বসবার বেঞ্চের একাংশ তাকে ছেড়ে দিলেও মনের মধ্যে কেউ তাকে তারা গ্রহণ করতে পারে নি। নিরুপায় লালুও তাই প্রচণ্ড এক অভিমানে তার সত্যিকারের পরিচয়টা না দিয়ে সকলের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান বাঁচিয়েই চলেছে প্রথম থেকেই।

লালু একটু তাড়াতাড়িই চলছিল। অন্ধ ভুলু পারছিল না তার সঙ্গে হাঁটতে। ভুলু বলে, তাই বলে অত তাড়াতাড়ি চলছিস কেন ?

তোর যেন খিদে-তেষ্টা নেই ; খিদেয় আমার পেট চনচন করছে। লালু বলে।

কিন্তু তা তো নয়। তুই কেন যেন রেগে গিয়েছিস বলে মনে হচ্ছে হ্যা রে, রাজপুত্তুরের দিদিকে গান শোনাতে যাব বলে তুই রাগ করেছিস, না ! ভুলু শুধায়।

বয়ে গেছে আমার কারো উপর রাগ করতে। যা না তুই, যতবার খুশি যাকে ইচ্ছা গিয়ে গান শুনিয়ে আয়। কে তোকে মানা করছে। যতই তোষামোদ কর, কোনদিনই ওরা তোকে তাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে তোকে তাদের একজন ভাববে না। তুই

যেমন পথের ছেলে আছিস তেমনি পথেরই ছেলে থাকবি।

কি তোর হয়েছে বল তো লালু! কি সব যা-তা আবোল-তাবোল বকছিস। স্কুলে পড়ে এই বুঝি তোর শিক্ষা হচ্ছে রে?

লালু আর ভুলুর কথার কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে পথ চলতে থাকে।

ঘরে ফিরে দুজনে খেতে বসে। ভূতোর মা ওদের খাইয়ে এঁটো বাসনগুলো নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

ভুলু বিছানায় শুয়ে পড়ে, লালু লণ্ঠনের আলোয় বই খুলে বসে। কিন্তু খোলা বইয়ের পাতার দিকে নিরর্থক দৃষ্টি নিয়ে কেবল তাকিয়েই থাকে, একটা লাইনও পড়তে পারে না। এলোমেলো চিন্তা তার মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে থাকে। স্কুল, লেখাপড়া, পাস, এসব করেই বা তার কী লাভ হবে? পরিচয়হীন অবহেলিত সমাজবহির্ভূত—এই তো তার পরিচয়। কেউ তো কোনদিন বিশ্বাস করবে না, একদা তারও পরিচয় ছিল। ভদ্রসন্তান সে। আজ এই যে পথের ছাপ তাদের গায়ে পড়েছে, দুঃখের আঁচ গায়ে লেগেছে, এ ছাপই কি কোনদিন উঠবে। না মুছে যাবে। তবে কেন এ ব্যর্থ পণ্ডশ্রম? হঠাৎ নজর পড়ে ভুলুর দিকে। একটা নোংরা ছেঁড়া শার্ট ও ছেঁড়া অপরিচ্ছন্ন ধুতি পরিধানে, ময়লা শয্যার ওপরে ভুলু ঘুমিয়ে আছে পরম নিশ্চিন্তে। এই নোংরা বস্তির অস্বাস্থ্যকর ঘর। কী কুৎসিত এই চারপাশে পরিচিত বস্তির লোকগুলো। কী নোংরা তাদের জীবন। কী কদর্য তাদের রুচি। তাদের সমবয়স্ক আরও সাত-আটটি কিশোর এই বস্তির মধ্যে থাকে—হাপলা, টুনু, মানিক, পটলা, হেরো ইত্যাদি। কেউ মোট বয়, কেউ বাবুদের বাড়িতে ছোকরা চাকরের কাজ করে, কেউ চায়ের রেস্টুরেন্টে ডিস-কাপ ধোয়, কেউ বাসের টিকিট বিক্রি করে, কেউ বাবুদের বাড়িতে গাড়ি ধোয়। ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসে, অশ্লীল হিন্দী সিনেমার গান গায়,

বিড়ি ফোঁকে আর যত সব নোংরা জঘন্য কুৎসিত ঠাট্টা-ইয়ারকি। লালুকে দেখলেই টিটকারি দেয়, বাবু স্কুলে পড়তে চলেছে রে! ভদ্দরলোক রে আমার! কত সাধই হয় গো চিতে, হাকিমের বেধারা হতে। না না—নিস্তার নেই লালুর। এই অভিশাপের বেষ্টনী থেকে মুক্তি নেই তার। মুক্তি নেই। যত দিন পথে পথে ও গান গেয়ে উপার্জন করে বেড়াত, স্কুলে ভর্তি হয় নি, ততদিন তো কই ওরা কেউ তাকে এড়িয়ে চলে নি, কেউ পর ভাবে নি! আজ যেন ও ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।" কলই বা কী হয়েছে তাতে? যাদের কাছে গেল ,তারাও তো ওকে আপন বলে গ্রহণ করে নি আর যারা একদিন ওকে আপন ভাবত তারাও আর তাকে গ্রহণ করছে না আজ। সে আর কারও নয়। এদেরও নয়, তাদেরও নয়। সে একা। আজ তার কেউ নেই। হঠাৎ ভুলুর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে, এই লালু, এখনও জেগে আছিস? পড়ছিস না?

ক্লিষ্ট কণ্ঠে লালু বলে, পড়াশুনো আর করবো না ভুলু, কাল থেকে স্কুল ছেড়ে দেব।

ভুলু শয্যা থেকে উঠে লালুর পাশে এসে বসল, ধীরে ধীরে তার গায়ে একটা হাত রেখে বলল, কী হয়েছে তোর বল তো?

কিছু হয় নি। পড়াশুনা আর করব না, তাই বললাম।

পড়াশুনো করবি না তো কি ঐ মানকে-পটলার মতো রেস্টুরেন্টে ডিস-কাপ ধুবি?

তাই। তাই করব, এর চাইতে সেও ঢের ভালো।

পাগলামি করিস না লালু। অবস্থার বিপর্যয়ে আজ আমাদের দুঃখ পেতে হচ্ছে বলে সেটাই তো সত্য নয়।

ভুলে যাস নি ভুলু, যতই তুই লেখাপড়া শেখ, তোর গায়ে যে রাস্তার ধুলো লেগেছে, সে ময়লা আর মুছবে না। লালু বলে ওঠে।

সেও তোর ভুল ধারণা। ভুলু জবাব দেয়।

ভুল ধারণা!

হ্যাঁ। মানুষের জন্ম বা অবস্থাটাই তার একমাত্র পরিচয়পত্র নয় সমাজে। লেখাপড়া শিখে হয়তো তুই একদিন ভদ্রভাবে ভদ্র জীবন যাপন করবার অবকাশ পাবি। বাঁচবার অধিকার পাবি। যত জানবি, যত শিক্ষা করবি, তত তোর মন ব্যাপ্ত হবে। বাবা বলতেন, বিদ্যা ও শিক্ষা মানুষকে শুধু ধনসম্পদ ও পদমর্যাদাই দেয় না, মানুষ হয়ে মানুষের মতো বাঁচবার ভিত গড়ে দেয়। আমাদের জীবনটা এমনি পথে পথেই কেটে যাবে, তা তো আর হতে পারে না ভাই। আমরাও বাঁচতে চাই, মানুষের মতো মানুষ বলে পরিচিত হতে চাই। ময়লা দাগের কথা বলছিস্, সে দাগকে যদি আমরা আমাদের চেষ্টা ও পৌরুষ দিয়ে অস্বীকারই না করতে পারি তবে কিসের আমরা মানুষ রে! তা ছাড়া আমার কথা ভুলিস না ভাই, অন্ধ আমি, অক্ষম, আমি যে তোর মধ্যে দিয়েই বাঁচতে চাই ভাই।

— ভুলুর কথাগুলো যেন লালুর মনে একটা শান্তির প্রলেপ এনে দেয় তখনকার মতোই বুঝি। দু হাতে সে ভুলুকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে তুই ক্ষমা কর ভুলু! আমি বড় স্বার্থপর!

ওসব কথা এখন থাক। অনেক রাত হয়েছে। চল, এখন ঘুমুবি চল্।

॥ বারো ॥

মণিকা বাড়িতে ফিরে এল সে-রাত্রে বাকী পথটুকু লালু ভুলুরই কথা ভাবতে ভাবতে।

দোতলার প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মনে এল সুরজিতের পোষা কাকাতুয়াটা দাঁড়ে বসে একমনে ডেকে যাচ্ছে— মনু! মনু! মনু!

অবোধ পাখিটা রোজই এমনি ডাকে আপন মনে। সময় অসময়

নেই, অমনি করে মনু মনু বলে ডাকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মণিকা দাঁড়াল দাঁড়ের সামনে। পাখিটা তার ঝুটিওয়ালা মাথাটা হেলিয়ে বারকয়েক তাকাল ওর দিকে, তারপর আবার ডেকে উঠল, মনু! মনু!

মণিকার চোখের কোলে জল ভরে আসে। এ বাড়ির সবাই ভুলেছে মনুর কথা, ভোলে নি কেবল ঐ পাখিটা। পাখিটার দাঁড়ের বাটিতে কয়েকটা শুকনো ছোলা পড়ে আছে মাত্র, মণিকা চেয়ে দেখল। মনুর মৃত্যুর পরই শ্যামা আর সুরেন ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছে। বেচারী মনুর মৃত্যুশোকটা সহ্য করতে পারে নি তারা। অনেক দিনকার পুরাতন ঝি-চাকর শ্যামা আর সুরেন এ বাড়ির। তিন বছরের মনুকে রেখে তার মা যখন ক্ষয়রোগে মারা যান, সেই থেকেই শ্যামা কোলে-পিঠে করে মনুকে মানুষ করেছিল। এবং তাই হয়তো তারা এ বাড়িতে টিকতে না পেরে পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু মণিকা যাবার তো স্থান নেই। সে যাবে কোথায়? সুরেনই পাখিটার দেখাশোনা করত। আজ সুরেন নেই। পাখিটাকে হয়তো কেউ নিয়মিত দুটি ছোলা খেতেও দেয় না।

মণিকা হাঁক দিল, এই সাধু, হরি, বিন্দি!

দিদিমণির ডাক শুনে চাকর-চাকরানীর দল ছুটে এল বারান্দায় হন্তদন্ত হয়ে।

হ্যাঁ রে, এতগুলো লোক তোরা এ বাড়িতে আছিস, পাখিটাকে কি কেউ তোরা রোজ দুটি করে খেতেও দিতে পারিস না!

হরি বললে, আমিই তো কাল পাখিকে ছোলা দিয়েছিলুম দিদিমণি!

কাল দিয়েছিলি আর আজ বুঝি ওর ক্ষিদে পায় না! যা, চারটি ছোলা এনে দে। হরি চলে গেল।

দিন দুই বাদে মণিকা সকালের দিকে বারান্দায় একটা চেয়ারে

বসে বসে পড়ার বই পড়ছে, কানে ভেসে এল একটি পরিচিত কিশোর কণ্ঠের গান। দূর থেকে অস্পষ্ট,

রাজপুত্তুর, সোনার রাজপুত্তুর :
কোন দেশেতে থাক ?
শুধাই তোমায় বাখাল ছেলে,
মোদের কথা ভাব ?

মণিকা তড়াতাড়ি উঠে পড়ল। হরিকে ডেকে বললে, হরি যা তো, রাস্তায় যে অন্ধ ছেলেটি গান গাইছে তাকে উপরে ডেকে নিয়ে আয়।

হরি একটু অবাক হয়ে দিদিমণির মুখের দিকে তাকায়। বড় বাড়ির চাকর সে, এখানকাব নিয়মকানুনের সঙ্গে সে পরিচিত। এমনটি তো কখনো এখানে হয় না।

যা না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? ডেকে নিয়ে আয় না ? মণিকা আবার বলে।

এবারে হরি গিয়ে রাস্তার ওপাশে পার্কের ধারে যেখানে বসে অন্ধ ভুলু আপন মনে গান গাইছিল, সেখান থেকে তাকে ডেকে নিয়ে আসে। ভুলুও কম অবাক হয় নি।

একেবারে সোজা বাড়ির মধ্যে ডাক !

ভুলুকে সসংকোচে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে দেখে মণিকা স্নেহভরা কণ্ঠে বলে, এসো ভুলু, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? এসো, বোসো। তুমি যে একা ? তোমার সেই বন্ধু লালু কোথায় ?

সে তো আজকাল রাস্তায় রাস্তায় আমার মতো গান করে না দিদিমণি, সে যে স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

মণিকা বলে, ও হ্যাঁ ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি সেদিন বলেছিলে বটে।

সত্যি। মণিকা একটু অবাক হয়ে যায়।

জানেন দিদিমণি। লেখাপড়ায় ছেলে সে খুব ভালো। আগে

তো পড়াশুনা করত, তাই আবার স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভুলু, বোসো। দেখো ঐখানেই একটা চেয়ার আছে তোমার সামনে।

ভুলু এবারে আস্তে আস্তে সংকোচের সঙ্গে বলে, কিন্তু আমার জামা-কাপড় যে ময়লা, নোংরা দিদিমণি।

ময়লা, নোংরা তাতে কিছু হবে না, আমি বলছি তুমি বসো চেয়ারটায়।

অতি সংকোচের সঙ্গে ভুলু এবার চেয়ারের উপর বসে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মণিকা ভুলুকে সব কথা জিজ্ঞাসা করে। শুনতে শুনতে মণিকার বিস্ময়ের আর যেন অবধি থাকে না।

এ এক নতুন কাহিনী যেন।

ভুলু বলে, লালুর সংকোচ ছিল দিদিমণি, আমাকে ফেলে সে একা স্কুলে যাবে না। কিন্তু ওর মনের ইচ্ছা আমি জানতে পেরেছিলাম ; মনে মনে ওর ভারি পড়াশুনা করবার শখ। আমাদের অবস্থার জন্যই ও পারছিল না। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, কেন পড়বে না ? ও পড়ুক না, ও যদি পড়াশুনা করে মানুষ হতে পারে তবে তো আর আমাদের দুঃখ থাকবে না। তাই না দিদিমণি।

মণিকা অবাক হয়েই ভুলুর কথাগুলো শুনছিল। সামান্য একটি কিশোর বালকের মনে তারই এক বন্ধুর জন্য এতখানি দরদ, এতখানি ভালোবাসা !

একসময় একটু চুপ করে থেকে মণিকা বলে, কিন্তু ভুলু, লেখাপড়া শিখে ও বড় হয়ে যদি তোমাকে না দেখে ? তোমার আজকের এ ঋণ ও যদি না স্বীকার করে ?

তাই কি কখনও হয়। না, না—, তারপর কী ভেবে একটু চুপ করে থেকে বলে, আর তা যদি হয়ই তো হোক। ও তো বড় হবে। ও যে আমার চাইতেও দুঃখী দিদিমণি। সব দেখে শুনে বুঝেও ও খোঁড়া—আর আমি অন্ধ। দেখতে পাই না এই যা। আর তো

আমার কোন দুঃখ নেই।

আশ্চর্য হয়ে যায় মণিকা এই কিশোর মনটির পরিচয়ে। নিজে অন্ধ, তার জন্য এতটুকু দুঃখ বা অভিযোগ নেই, বন্ধুটি তার খোঁড়া সেই দুঃখেই মনে মমতার প্লাবন বয়ে চলেছে। নিঃস্বার্থভাবে তার জন্য পথে পথে গান গেয়ে ভিক্ষা করে তার পড়াশুনার খরচ যুগিয়ে চলেছে। রাস্তার আবর্জনার মধ্যে পড়ে থেকেও তার জন্ম ঐতিহ্যকে সে হারায় নি। অথচ অফুরন্ত পর্যাপ্ততা ও শিক্ষার মধ্যে সৎ সাহচর্যে থেকেও ঐ-বয়েসী কত কিশোর জাহান্নামের পথে এগিয়ে চলেছে! না আছে তাদের চরিত্র, না আছে সংযম। কেন এমন হয়? এর জন্য দায়ী কে? কারা? অথচ এরাই তো দেশের জাতির ভবিষ্যৎ। এরাই তো গড়ে তুলবে নতুন জাতির নতুন ইতিহাস একদিন।

একসময় মণিকা জিজ্ঞাসা করে, তোমার পড়াশুনা করতে ইচ্ছে করে না ভুলু?

করলেই বা টাকা কোথায়? আচ্ছা দিদিমণি, শুনেছি অন্ধদেরও নাকি শিক্ষার কত ব্যবস্থা আছে এ শহরে?

হ্যাঁ।

কিন্তু—, বলতে গিয়েও যেন ভুলু আবার থেমে যায়।

কিন্তু কী? মণিকা প্রশ্ন করে।

দুজনের লেখাপড়া শেখার মতো টাকা-পয়সা তো আমাদের নেই।

আমি যদি তোমার ব্যবস্থা করে দিই ভুলু?

দেবেন। সত্যি দেবেন! আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ভুলু, কিন্তু পরক্ষণেই ঝিমিয়ে যায়। কিন্তু লালুর খরচ কোথা থেকে আসবে?

তারও ব্যবস্থা করা যায়।

ভুলু এবারে চুপ করে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

কিঁ, কথা বলছ না যে?

না, তা হবার নয়।

কেন নয় ভুলু ?

সে তো আপনাদের কারো সাহায্য নেবে না। সে বড়লোকদের ভয়ানক ঘৃণা করে। তাদের সে দুচক্ষে দেখতে পারে না। এই যে আমি আপনার এখানে এসেছি, জানতে পারলে হয়তো ভারি রাগ করবে। তাকে মিথ্যা কথা বলেছি যে আজ সামনের পার্কে বসে দুপুরে গান গাইব। তাই সে পৌঁছে দিয়ে গেছে এখানে। দুপুরে টিফিনের সময় আবার পৌঁছে দিয়ে আসবে বাড়িতে।

কিন্তু বড়লোকদের উপরে তার এত রাগই বা কেন ?

তা তো জানি না।

একদিন তাকে নিয়ে আসতে পার ?

সে আসবে না !

চেষ্টা করো না একদিন।

করব। আজ আমাকে এখন কাউকে পার্কের ধারে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলুন না দিদিমণি !

হ্যাঁ, ভালো কথা। তোমাদের সেই বন্ধু, আমার ভাই, তোমাদের একটা জিনিস দিতে দিয়ে গেছে, দিলে সেটা নেবে ?

কেন নেব না ? দিন !

মণিকা রুমালে বাঁধা সোনার মোহরটা এনে ভুলুর হাতে তুলে দেয়।

॥ তেরো ॥

ভুলু ভেবেছিল রাজপুত্তুরের দিদির বাড়িতে যে সে গিয়েছে, বন্ধু লালুর কাছে কথাটা একেবারেই গোপন করে যাবে। লালু কথাটা জানতে পারলে মনে দুঃখ পাবে, হয়তো রাগও করবে, আদপেই লালুকে সে

জানাবে না। কিন্তু সেখান থেকে আসবার মুখে, মণিকার হাতে করে তাদের দুজনারই অতি প্রিয় সেই রাজপুত্তুরের রুমালটা দেওয়ার আনন্দ-সংবাদটা লালুকে না জানিয়েই বা সে থাকে কী করে! আনন্দে তার মন যে উপচে পড়ছে। দিতে হবে বৈকি লালুকে খবরটা। তাই লালু যখন এল টিফিনের সময় তাকে নিয়ে যেতে, দেখে ভুলু সেই রুমালটা বুকে চেপে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে নির্জন পার্কের লোহার রেলিঙে হেলান দিয়ে বসে আছে। লালুর পদশব্দ যে ওর পরিচিত—পদশব্দ পেয়েই ভুলু বলে ওঠে, লালু এলি! এই দেখ! বলতে বলতে বন্ধুর সামনে ভুলু দু হাত মেলে ধরে। লালু দেখে একটা সাদা রঙের রেশমী রুমাল। তাতে কিসের ছাপ।

কি রে ওটা? লালু শুধায়।

দেখ না!

হাতে নেয় রুমালটা লালু। কৌতূহলভরে রুমালটা দেখতে গিয়ে লালুর নজরে পড়ে রুমালে এক কোণে কী যেন একটা গিঁট দিয়ে বাঁধা আছে। গিঁটটা খুলে ফেলতেই সোনার বাদশাহী মোহরটা বের হয়ে পড়ে। বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় লালু।

এ কী রে! এ যে একটা সোনার মোহর!

সোনার মোহর!

হ্যাঁ, কিন্তু এ তুই কোথায় পেলি?

জানিস কে দিয়েছে?

কে তোকে দিল আবার এ মোহর?

বল তো কে!

কি করে বলব? আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না?

রাজপুত্তুর দিয়েছে ওটা আমাদের। যত্ন করে রেখে দিস তোর কাছে।

মুহূর্তে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা লালুর কাছে জলের মতোই যেন পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং পরমুহূর্তেই রোষে ক্ষোভে সহসা যেন

দপ্ করে জ্বলে ওঠে লালু। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তুই তা হলে আবার সেই বড়লোকদের পা চাটতে গিয়েছিলি ভুলু? আমাকে তুই মিথ্যা কথা বলে তা হলে পার্কের ধারে এসেছিলি?

লালু, ভাই!

আমার কথার জবাব দে ভুলু! কঠিন রুক্ষ কণ্ঠে আবার বলে লালু।

ভীত সংকুচিত কণ্ঠে ভুলু তবু বলে, সব বড়লোকেরাই সমান হয় না রে। সত্যি, দিদিমণি বড় ভালো. আদর করে আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসাল, কত কথা বললে।

লোভী ভিক্ষুক কোথাকার, তাই তুই অমনি গলে গেলি। ওরে গাধা, তুই বুঝিস না কেন, ওরা কুকুরের মতোই আমাদের পথের মানুষদের ঘৃণা করে!

না। না লালু—দিদিমণি সেরকম নয়।

সেরকম নয়!—ওদের চিনতে আর আমার বাকী নেই। নে, তুই রেখে দে তোর বড়লোক দিদিমণির দান! ও ছুঁতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে। ফিরিয়ে দিল লালু রুমালে-বাঁধা সোনার মোহরটা ভুলুর হাতে।

ভুলু যেন একেবারে পাথর হয়ে যায়।

চোখে তো দেখতে পাস না, মিশিসও না ওদের সঙ্গে, নইলে দেখতে পেতিস ওদের চোখে কী ঘৃণা, কী তাচ্ছিল্য। তেলে-জলে মিশ খায় না রে, তেলে-জলে মিশ খায় না!

ভুলু লালুর কথায় কিন্তু অত্যন্ত আঘাত পেয়েই চুপ করে থাকে। তার মনে হয়, চেনা সুরটা কোথায় যেন কেটে গিয়েছে। এই গত চার মাসে লালু যেন অনেক—অনেক বদলে গিয়েছে। এ যেন আর সেই পরিচিত পথের মধ্যে পাওয়া তার বন্ধু লালু নয়। তার সুরটিও যেন কেমন বেসুরো বাজছে।

লালুরও দোষ নেই। অসন্তোষের জ্বালায় সত্যিই তার মনটা

বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। মনের দুঃখে জ্বালায় ও অভিমানে যে অতীত পরিচয়কে লালু একদিন পশ্চাতে ফেলে এসেছিল, সেই জ্বালা ও অভিমানেই স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে হেডমাস্টার কুলদাবাবু যখন তার পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলেছিল মিথ্যা আক্রোশের বশেই সে, বাপের নাম সে জানে না। তার নিজের নামই সে জানে বস্তির মধ্যে সে মানুষ। তার নিজের পরিচয় সে নিজেই বহন করবে।

কৌতূহলের সঙ্গে কুলদাবাবু কিশোর লালুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

তারপরই লালু আবার হঠাৎ মুখ তুলে নিম্নকণ্ঠে বলেছিল, আমাকে পরীক্ষা করে নিন স্যার। যদি পরীক্ষায় আমি পাস করি তবে ভর্তি করে নেবেন।

কুলদাবাবু লালুকে নানাভাবে পরীক্ষা করে খুশীই হয়েছিলেন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি বুঝেছিলেন যে ময়লা বা আবর্জনার যে কুণ্ড থেকেই সে আসুক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে বালকটির, আর এও বুঝেছিলেন, যে কারণেই হোক লালু তার সত্যিকারের পরিচয়টা দিতে চায় না।

নিজ দায়িত্বেই কুলদাবাবু লালুকে ভর্তি করে নিয়েছিলেন, এবং সর্বদা নজর রাখছিলেন ওর উপরে। মাসখানেকের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর নির্বাচন ভুল হয় নি। সত্যিই তীক্ষ্ণ মেধাবী ছেলেটি। কিন্তু গোল বাধল কয়েকটি শিক্ষক ও সহপাঠীদের নিয়ে। তারা ঠিক সহ্য করতে পারছিল না, হঠাৎ কোথাকার এক বস্তির অজ্ঞাত খোঁড়া ছেলে এসে তাদের উপরে টেক্কা দিয়ে যাবে। ক্লাসের কয়েকটি দুষ্ট ছেলে লালুর পিছনে লাগল। নানাভাবে দিনের পর দিন তাকে নির্যাতন ও অপমান করতে শুরু করে দিল।

প্রচণ্ড অভিমানী তেজী ও একরোখা চিরদিন লালু। সেও নীরবে সব সহ্য করে চুপ করে গেল না। ঘাত-প্রতিঘাতে সংঘর্ষ জেগে উঠলো। নিরুপায় আক্রোশে লালুও ফুলতে লাগল। মনে মনে

অনেক আশা নিয়ে নিজের শৈশবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লালু স্কুলে এসে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তার মনের জ্বালায় কোথায় তলিয়ে যেতে লাগল। তারপর একদিন স্কুলের একজন সহপাঠী লালুকে অন্ধ ভিক্ষুক ভুলুকে নিয়ে বস্তির দিকে যেতে দেখে অলক্ষ্যে তাকে অনুসরণ করল। এবং বস্তির সব সংবাদ জেনে এসে পরের দিন সহপাঠীমহলে সব কথা ফলাও করে বললে।

স্কুলে ছেলের দল সব শুনে হৈ-হৈ করে উঠলো।

ঐ ব্যাপারটা ঘটলো ঠিক সেই দিন টিফিনের আগের অফ্ পিরিয়ডে, যেদিন ভুলু গিয়েছিল মণিকাকে গান শোনাতে।

স্কুল থেকে জ্বলতে জ্বলতে ভুলুর কাছে ফিরে এসে ভুলুর হাতে ঐ রুমাল ও সোনার মোহর দেখে এবং তার মুখে ঐসব কথা শুনে তাই একেবারে যেন খেপে উঠল লালু।

বাসায় ফিরে লালু বললে, আর তুই গান গেয়ে ভিক্ষে করতে পারবি না।

ভিক্ষে করা কেন হবে? আমি তো গান গেয়ে টাকা রোজগার করি?

রাস্তায় বসে তুই ওভাবে গানও গাইতে পারবি না। ওতে করে লোকে তোকে ভিক্ষুকই বলবে।

কিন্তু তা না করলে টাকা আসবে কোথা থেকে রে?

না, করতে পারবি না।

তারা ভিক্ষুক বলছে বলুক না, তাতে হয়েছে কী? ভিক্ষা মানেই দৈন্য নয় রে। তুই কি পড়িস নি ভগবান তথাগতও ভিক্ষা করতেন? আর তা ছাড়া ভিক্ষা করে না কে? কেউ প্রাসাদে বসে করে, কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে করে।

কিন্তু আমি আর তোকে নিয়ে যেতেও পারব না, নিয়ে আসতেও পারব না।

লালুর শেষের কথাগুলো যেন একটা বুলেটের মতোই এসে ভুলুকে বিদ্ধ করে। কয়েকটা মুহূর্ত সে কোনো জবাবই দিতে পারে

না। মূক হয়ে থাকে। বোধ করি একটা দীর্ঘশ্বাস বুকটা কাঁপিয়ে বের হয়ে যায় তার।

তারপর মৃদু কণ্ঠে একসময়ে বলে, তাই হবে। আগেও তো আমি হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতাম। তাই না হয় চলব।

কথাটা বলেই লালু কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কথাটা ঐভাবে লালু বলতে চায় নি, মনের জ্বালায় রূঢ় হয়ে গিয়েছিল। লালু বলে—ভুলু, তুই আমাকে ভুল বুঝিস না। আমি যে ঠিক কেন—

না ভাই! ভুল বুঝব কেন? সত্যিই তো আমিই বুঝতে পারি নি। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু তুই স্কুলে গেলি না? স্কুল ছুটি হয়ে গেছে নাকি?

না, এই যাচ্ছি।

॥ চোদ্দ ॥

ঐ ব্যাপারের পর লালু লজ্জায় আর যেন ভুলুর সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। তাড়াতাড়ি কোনমতে ক্রাচটা বগলে লাগিয়ে খট খট শব্দে পালিয়ে যেন বাঁচবার জন্যই রাস্তায় গিয়ে হাঁটতে শুরু করল এবং স্কুলের দিকে না গিয়ে সোজা যেদিকে দু চোখ যায়, জনবহুল পথ ধরে হাঁটতে লাগল অন্যমনস্কভাবে।

আর ভুলু।

ধীরে ধীরে একসময় মাটিতে বসে পড়ল। ভুলু ভিক্ষুক, ভিক্ষার অন্নে সে জীবনধারণ করছে, সমাজের নিম্নস্তরে তার স্থান। প্রকারান্তরে এই কথাটাই লালু তাকে আজ যেন স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়ে গেল। অথচ আশ্চর্য, লালু আজ ভুলে গেছে যে, মাত্র চার মাস আগেও দুজনে মাউথ অর্গান বাজিয়ে ও শিস দিয়ে উপার্জন করে পেট চালিয়েছে, কলকাতা শহরের অসংখ্য [illegible] মতোই ফুটপাথে,

বারান্দার নীচে, বসতে গেলে এক প্রকার রাস্তায় শুয়েই রাত কেটেছে তাদের। লালু যে ভদ্রসন্তান, অবস্থা-বিপর্যয়ে পড়ে সে কথা ভুলে গেলেও, আজ আবার সেই ভদ্র পরিবেশের মধ্যে ফিরে গিয়েই তার অতীত আভিজাত্যের অহমিকাটা টনটন করে উঠেছে। কিন্তু কই, ভুলুও তো ভদ্রসন্তানই, সেও তো স্কুলে লেখাপড়া শিখছিল। দেশবিভাগের বিপর্যয়ে এই পথের আবর্জনায় ছিটকে এসে পড়েছে। সে তো সেই অতীত দিনগুলোকে স্মরণ করে কাঁদছে না, আপসোসও করছে না!

সত্যিই ভুলুর সেজন্য কোন আপসোস বা দুঃখ নেই। বিপর্যয়ের ঝড় তাকে যেখানেই এনে ফেলুক না কেন, তার বাবার কথাগুলো আজও সে ভুলতে পারে নি। বাবা বলতেন, মানুষ কেউ ছোট না। আজ যে সমাজের মধ্যে এই স্তরবিভাগ, একদল অন্যদলকে এড়িয়ে চলছে, কৃপার দৃষ্টিতে দেখছে, এর জন্য দায়ী আমাদের আজকের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। আজ যারা পথের একপাশে প্রাসাদ ও ভদ্র-জীবন থেকে দূরে বস্তিতে ও অন্ধকারে অস্বাস্থ্যকর জীবন কাটাচ্ছে তারাও সুযোগ-সুবিধা পেলে অন্য দলের পাশে এসে কাঁধে কাঁধ দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে।

ভুলু বিশ্বাস করে বাবার সেই কথা। এবং আশা রাখে এই স্বাধীন দেশের সমাজ ব্যবস্থায় একদিন সে শুভ মুহূর্ত আসবে।

যত ভুলু ঐসব কথা ভাবে ততই লালুর প্রতি তার ক্ষোভটা যেন জুড়িয়ে আসে। মুহূর্তের জন্যও যে লালুর প্রতি তার মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল এই ভেবে লজ্জার যেন তার অবধি থাকে না।

কিন্তু অভিমানকে সে একেবারে জয় করতে পারে না। সব মুছে গিয়েও অভিমানের ছোট কাঁটাটা বুকের এক কোণে খচখচ করতে থাকে। এই আট-নয় মাসের সাহচর্যে সে তার কিশোর বুকের সবটুকু ভালোবাসাই যে লালুকে ঢেলে দিয়েছিল। সেই আপন-ভোলা ভালোবাসাই আজ অভিমানের মধ্যে বেঁচে থাকে। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে, না আর সে লালুকে তার ভিক্ষার দৈন্যের মধ্যে টেনে

এসে জড়াবে না। সত্যিই তো, লালু যদি আবার তার পরিচিত জীবন ও পরিবেশের মধ্যে ফিরে যাবার সুযোগ পেয়ে থাকে, কেন সে নিজের দৈন্য নিয়ে তার সামনে গিয়ে তাকে লজ্জা দেবে? অন্ধ হলেও লালুর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে তো এই শহরে আসা অবধি কারো সাহায্য না নিয়েই একাই চলাফেরা করেছে সে। এবার থেকে পূর্বের মতোই আবার সে চলাফেরা করবে একা একা। দিনের পর দিন যে পথ দিয়ে লালু তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে, দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সে পথের সঙ্গে তার পরিচয় না ঘটলেও, তার দুটি পায়ের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। পায়ের পাতার স্পর্শের ভিতর দিয়েই অনায়াসে সে পথ কি সে চিনে নিতে পারবে না?

উঠে দাঁড়াল ভুলু, হাতড়ে হাতড়ে ঘরের কোণ থেকে চিরপরিচিত তার লাঠিটা খুঁজে নিয়ে হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে এক পা এক পা করে ঘর থেকে বের হল।

ঠুকঠুক শব্দে লাঠি ফেলে ফেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল ভুলু পথটা অনুভব করে করে।

একা! আবার সে একা!

ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ। হে দয়াময়, তুমি আমার চক্ষুর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছ বটে, তবে পা দুটিকে আর মস্তিষ্ককে তো সুস্থ রেখেছ। এই তো আমার ঢের। এই তো আমার সব।

ঠুকঠুক করে লাঠির সাহায্যে এগিয়ে চলল ভুলু। এবং সময় অনেকটা লাগলেও একসময় সত্যি সত্যিই সে তার পার্কের ধারে নির্দিষ্ট জায়গাটিকে ঠিক চিনে এসে বসল।

বড় ট্রাম রাস্তাটা একজন দয়ালু পথিক তাকে হাত ধরে পার করিয়ে দিয়েছেন। রোজকার মতো ভুলু গান গাইবার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু গান আজ আর গলা দিয়ে বের হয় না। চোখের জলে গাল ভেসে যায়। কতক্ষণ অমনি চুপচাপ বসে ছিল, কতক্ষণ চোখের জলে গাল ভেসে গিয়েছে, ওর খেয়াল নেই। হঠাৎ খেয়াল হতেই

লজ্জায় তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে ও গান ধরল।

. গান যখন ও থামাল, একটি অত্যন্ত পরিচিত নারী-কণ্ঠ যেন সহসা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতো ওর কানে এসে প্রবেশ করে এবং কণ্ঠস্বরটি শোনামাত্রই ওর চিনতে কষ্ট হয় না কার সে কণ্ঠস্বর!

পরিচিত নারী-কণ্ঠস্বরটি অন্য একটি নারীকে সম্বোধন করে বললে, চল! চল সুমি! কোথাকার কে পথের ধারে গান গাইছে অমনি তুই দাঁড়িয়ে পড়লি, মণিকার বাড়ি যেতে হবে না?

দ্বিতীয় নারী-কণ্ঠ জবাব দেয়, কিন্তু কী মিষ্টি গান গাইলে বল তো বীণা!

বীণা! বীণা! তাহলে তার চিনতে ভুল হয় নি? তার দিদিই? কিন্তু তার দিদিও কি তার গলার স্বরে তাকে চিনতে পারল না? ডাকবে কি একবার দিদি বলে? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, না। না—আজ তার কী পরিচয় আছে আর! এক অন্ধ ভিক্ষুক গান গেয়ে ভিক্ষা করছে পথের ধারে বসে। যদি লজ্জা পায় দিদি? দিদির বন্ধুর সামনে দিদিকে সে লজ্জা দেবে? ছোট করবে তার দিদিকে? না। না। আজ দ্বিপ্রহরের লালুর কথাগুলো তার মনে পড়ে যায় আবার যেন নতুন করে।

আবার তার দিদির কণ্ঠস্বর কানে আসে, কিছু দিবি তো দে, দিয়ে চল। ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কার একখানি চুড়ি-পরা নরম হাতের আঙুলগুলোর ডগা আলতোভাবে যেন ভুলুর হাতের পাতা স্পর্শ করে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় সেই দ্বিতীয় নারীর কণ্ঠস্বর, এই নাও।

একটা সিকি হাতের মধ্যে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যেন তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতোই উদ্যত হাতটা সরিয়ে নিয়ে ভুলু বলে, না। না—এ আমার চাই না! নিন, আপনি ফিরিয়ে নিন।

কেন, নেবে না?

না। আপনি ফিরিয়ে নিন।

এঃ! ভিক্ষে করতে বসে আবার তেজ দেখো না! ভিক্ষুকদেরও আজকাল আত্মসম্মান জেগেছে রে সুমি। চল চল। বীণা তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলে ওঠে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভুলু সমান তেজের সঙ্গে জবাব দেয়, না, ভিক্ষে আমি করি না। গান গেয়ে আমি পয়সা উপার্জন করি। এ আমার পরিশ্রমের উপার্জন।

ঠিক বলেছ খোকা। মোলায়েম একটি পুরুষ-কণ্ঠে কে যেন কথা বলে ওঠে পাশ থেকেই সেই সময় আচমকা।

এক্ষুনি হয়তো নানারকম কথা উঠবে। বীণা আর তার বান্ধবী সুমিতা ভিড়ের মাঝখান থেকে সরে পড়ে।

ভুলুও উঠে দাঁড়ায় বাড়ি ফিরবার জন্য।

মাথাটার মধ্যে কী এক অসহ্য যন্ত্রণা যেন টনটন করছে।

লাঠিটার সাহায্যে এগিয়ে চলে ভুলু ঠুক ঠুক করে।

পিছন হতে এমন সময় সেই পুরুষ-কণ্ঠস্বরটি আবার শোনা যায়, ও খোকা? শুনছ? একটু দাঁড়াও!

ভুলু তবু দাঁড়ায় না। যেমন চলছিল তেমনি চলে।

ও খোকা শুনছ! শোনো! শোনো! কথা আছে। পূর্ব বক্তা আবার বলে।

এবারে ভুলু দাঁড়াল, যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই।

॥ পনেরো ॥

কিশোর ভুলুর কচি বুকটা যেন নিদারুণ অভিমানে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। তবু অপরিচিত এক ভদ্রলোকের সস্নেহ ডাকে সে না দাঁড়িয়ে পারল না।

অন্ধ চোখের কোল দুটো তখন জলে ভরে গিয়েছে। সন্তর্পণে

হাত দিয়ে চোখের কোল দুটি মুছে নিল। কাঁদবে না সে, কেন কাঁদবে? এত সহজে সে পরাজয় মানবে কেন?

তোমার নাম কি? ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

ভুলু।

থাক কোথায়?

আমাদের মতো দুঃস্থ অন্ধ আতুর যেখানে থাকতে পারে সেইখানেই থাকি।

এইভাবে পথে বসে গান গেয়ে উপার্জন না করে অন্য ভাবেও তো তুমি টাকা উপায় করতে পার, ভুলু। এত চমৎকার তোমার গলা! এমন সুন্দর গান গাইতে পার তুমি!

কি আপনি বলছেন বাবু?

হ্যাঁ—শোনো, গ্রামোফোন রেকর্ডে তুমি গান গাইবে?

গ্রামোফোন রেকর্ডে! তারা আমাকে গান গাইতে দেবে কেন-বাবু? আর তা ছাড়া গান গাইতে আমি কতটুকুই বা জানি, কতটুকুই বা আমার শিক্ষা?

সে ভাবনা তোমার নয় ভুলু। গান যদি তুমি গাইতে রাজী থাক, সব ব্যবস্থা আমি করব।—কি বল, গাইবে?

ভুলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, না বাবু! কটা টাকাই বা রেকর্ডে গান গেয়ে আমি পাব! রোজ রোজ গান গেয়ে টাকা না রোজগার করলে তো আমার চলবে না!

প্রথম প্রথম হয়তো বেশি টাকা তুমি পাবে না। কিন্তু একবার গান যদি তোমার লোকে নেয় তখন আর তোমার কোনো অভাবই থাকবে না—তোমার ঠিকানাটা বলো, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে স্টুডিওতে নিয়ে যাব।

আমাকে একটা রাত ভাববার সময় দিন বাবু। কাল এই সময় আপনি দয়া করে এলে আমি বলব।

বেশ, তাই বোলো।

ভদ্রলোকের নাম সুধাংশুবাবু, গ্রামোফোন কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ফুটপাথের ধারে যেখানে বসে ভুলু গান গাইছিল, তার অল্প দূরে গাড়ি থামিয়ে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে আচমকা ভুলুর গান তাঁর কানে যেতেই তিনি আকৃষ্ট হন। দীর্ঘদিন রেকর্ড সেকশনে থেকে গানের কণ্ঠ সম্পর্কে তাঁর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ভুলুর কণ্ঠে গান রেকর্ড করতে পারলে যে লোকে নেবে, এটা তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারাই বুঝেছিলেন।

ভুলুর মনের মধ্যে তখন সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার দিদি বীণা. সত্যিই কি সে তার ভাইকে, নিজের মায়ের পেটের আপন ভাইটিকে চিনতে পারল না। না ভাগ্যবিপর্যয়ে আজ সে পথে এসে বসেছে বলে তাকে চিনতে পেরেও না চেনবার ভান করল।

লালুর পরিবর্তনে লালুর উপরে অভিমান হয়েছিল তার। কিন্তু মায়ের পেটের বোন। আজ যে সেই তাকে স্বীকৃতি দিল না। স্নেহ দয়া মায়া ভালোবাসা এসবের কি আজ আর মানুষের কাছে কোনো মূল্যই নেই?

ঠুক ঠুক করে লাঠিটা দিয়ে রাস্তা অনুভব করে করে ভুলু পথ হেঁটে চলেছে, আর কে যেন অবিশ্রান্তভাবে তার কানের কাছে বলে চলেছে—ওরে তুই যে পথের ভিক্ষুক! তুই যে পথের ভিক্ষুক!

এক ঘণ্টার পথ প্রায় আড়াই ঘণ্টায় অতিক্রম করে সে যখন কোনোমতে তার পরিচিত বস্তির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, লালুর কণ্ঠস্বর তার কানে এল।

একা একা তুই রাস্তায় বের হয়েছিলি ভুলু! এগিয়ে এসে লালু ভুলুর একটা হাত ধরল।

অতি মৃদুভাবে লালুর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ভুলু বললে, পথ তো আমি চিনি।

আচ্ছা আক্কেল তো তোর? অন্ধ মানুষ, ভেবে আমি মরি!

ভাবনার এতে কি আছে? চল—ঘরে চল।

হা ভাবনার নেই! বলছিস কি! যদি গাড়ি চাপা পড়তিস?

না হয় পড়তামই! এক অন্ধের জীবনের উপরে যবনিকাপাত ঘটত। দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে এমনও তো কেউ নেই আমার।

এসব কথার মানে?

কিছু না। কিন্তু বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। তুই খেয়েছিস?

না, খাবার সময় পেলাম কখন, এসে দেখি তুই নেই। যা দুর্ভাবনা হয়েছিল!

যা, মাসীকে ডেকে খাবার দিতে বল।

আহারাদির পর একসময় ভুলু বললে, হ্যাঁ রে, পড়াশুনা কেমন এগুচ্ছে?

ভালোই। তবে অনেক পুরনো পড়া নতুন করে আবার পড়ে নিতে হচ্ছে। পরীক্ষাও কাছে এসে গেল। টাকা থাকলে ভুবেনবাবুর কোচিং ক্লাসে ভর্তি হতে পারতাম।

কত লাগবে সেই ক্লাসে ভর্তি হতে?

সে অনেক। ওসব স্বপ্ন দেখাই আমাদের পাগলামি।

তবু শুনি না, কত?

মাসে কুড়ি টাকা।

ভুলু লালুর কথাটা শুনে মনে মনে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল।

তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, তুই কোচিং ক্লাসে ভর্তি হ লালু।

বলছিস কি! এত টাকা তুই কোথায় পাবি!

আছে রে, আছে। আমার জমানো আছে। তুই ভাবিস না।

সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ।

দেখিস, শেষকালে যেন না বেয়াকুব হতে হয়—

না রে না, তুই ভর্তি হ।

অন্ধকারে শয্যায় শুয়ে ভুলুর চোখের কোল দুটো জ্বালা করে আবার জল আসে। আজ কত অনায়াসেই লালু তার সম্পর্কে

নিশ্চিন্ত হয়ে চুপ করে গেল। একবারও সে বললে না যে, নিজে গিয়ে আগের মতোই সে তাকে গানের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। সে যেন একা একা আর না যায়। অনেক দিন পরে আজ আবার ভুলুর নিজেকে যেন বড় একা মনে হয়। বাবাকে, নিজের বাবাকে মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর সেই কথাগুলো, বিপদ যত বড়ই আসুক না কেন—নিজের মনুষ্যত্ব, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসকে হারিও না ভুলু। মনে রেখো—ভগবান তাকেই সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করে। নিজেকে সাহায্য করতে জানে।

আরও মনে পড়ে বাবার মুখে শোনা সেই গানটি,—একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। মনের মধ্যে যে ঐ সঙ্গে একটা অভিমানও না জাগে তা নয়। কেনই বা সে এমনি করে লালুর জন্য নিজেকে ক্ষয় করে ফেলবে। তখনি আবার মনে হয়, ছি ছি। এসব সে কি ভাবছে! লালুর কাছে সে না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! বঞ্চনার বদলে সে কেন বঞ্চনা দেবে? না। না—লালু মানুষ হোক। এই পথের আবর্জনা দুঃখ অপমান থেকে সে মাথা তুলে দাঁড়াক। সেই হবে তার এই ব্যর্থ অন্ধ জীবনের শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা। সেও যে এই পৃথিবীতে এসে ব্যর্থ হয়ে যায় নি, তার মধ্যেই তার স্বাক্ষর থেকে যাবে। সেই তো তার সবার বড় পাওয়া।

পরের দিন নিয়মিত ফুটপাথের ধারে বসে আপন মনে গান গাইছে। সুধাংশুবাবু এলেন।

কি ঠিক করলে? গাইবে রেকর্ডে?

গাইব।

বেশ, তবে আজই চলো, তোমার গলাটা টেস্ট করে নেব।

চলুন।

সুধাংশুবাবু ভুলুকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। এবং কোম্পানিতে গিয়ে গলা টেস্ট করার পর ভুলু কনট্রাক্ট পেপার সই করে সুপারিশে অগ্রিম ২০টি টাকা নিয়ে বস্তিতে ফিরে এল রাত্রে।

এবং আরো কিছুক্ষণ পরে রাত্রে বস্তিতে ফিরে লালু দেখল, ভুলু বাসাতেই রয়েছে। গান গাইতে যায় নি।

ভুলু লালুর হাতে চাল্লশটি টাকা তুলে দিয়ে বললে, এই নে টাকা!

বিস্মিত হতবাক লালু প্রশ্ন করে, এত টাকা তুই কোথায় পেলি?

কোথায় আবার। বললাম তো, টাকা আমার কাছে ছিল।

লালু আনন্দে গদগদ হয়ে বললে, দেখিস ভুলু, আমিও তোর মুখ রাখব। আমি নিশ্চয়ই ফার্স্ট হব।

পারবি ফার্স্ট হতে?

নিশ্চয়ই, দেখে নিস।

॥ ষোল ॥

রিহার্সেল না দিয়ে তো রেকর্ডিং করা যাবে না। ভুলুকে তাই প্রত্যহ স্টুডিওতে যেতে হয় রিহার্সেল দেবার জন্য। ফলে পথের ধারে বসে গান গেয়ে রোজকার মতো উপার্জন করা আর আজকাল তার হয় না।

এদিকে স্কুলে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত টাকা-পয়সা ও খরচপত্রের ব্যাপারটা ও তার সমস্ত দায়-ভাবনা ভুলু নিজের কাঁধেই স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিল। দিন দশেক বাদে একদিন ভুতোর মা ভুলুকে দুপুরে এসে বললে, চাল-ডাল কিনতে হবে, টাকা-পয়সা হাতে আর নেই ভুলু।

একেবারে কিছুই নেই মাসী?

না। কিন্তু ব্যাপার কি বল তো? আজকাল কি গান গেয়ে আর তেমন পাচ্ছ না? দিন দশেক তো কিছুই এনে দাও না?

চিন্তায় পড়ে যায় ভুলু। রেকর্ড হবার আগেই অগ্রিম সে কুড়িটি টাকা সুধাংশুবাবুর সুপারিশে কোম্পানি থেকে যা পেয়েছিল এবং

পূর্বের জমানো আরো কুড়িটি টাকা যা তার কাছে ছিল সব লালুর হাতে তুলে দেওয়ায় হাত তার একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল। সর্বসমেত চল্লিশটি টাকা সে পাবে। বাকি মাত্র কুড়িটি টাকা। রেকর্ড হয়ে গেলে সেই টাকা সে পাবে। আর এখন সুধাংশুবাবুর কাছে চাওয়াও যাবে না। অথচ রিহার্সেল দিয়ে ফিরতে ফিরতে রাত আটটা তার হয়ে যায়। অতঃপর আর সময় থাকে না আগেকার মতো পথের ধারে গিয়ে বসে গান গেয়ে উপার্জন করবার। বেলা তিনটার সময় রিহার্সেলে নিয়ে যাবার জন্যে লোক আসে, সকালের দিকে তো অনায়াসেই ঘণ্টা দুই গান গেয়ে সে কিছু উপার্জন করতে পারে। হ্যাঁ। তাই সে করবে। কিন্তু তার আগে এখনি যে কিছু টাকার দরকার। কোথায় টাকা পাওয়া যাবে?

হঠাৎ মনে পড়ে, তার হাতে একটা সোনার আংটি ছিল। বাবার দেওয়া বলে হাত থেকে খুলে আংটিটা সে নিজের কাপড়ের খুঁটে সর্বদা সযত্নে বেঁধে রাখত। দুপুরের দিকে ভুতোর মাকে ডেকে আংটিটা কাপড়ের খুঁট থেকে খুলে তার হাতে দিয়ে বললে, মাসী, এক কাজ করো। এই আংটিটা বেচে কিছু টাকা নিয়ে এসো।

সে কি! আংটিটা তুমি বেচবে কেন? লালুকেই না হয় টাকার কথা বলি?

না। না—মাসি। তাকে বিরক্ত কোরো না। পরীক্ষা তার কাছে। তার মনকে বিক্ষিপ্ত করে দিও না এ সময় এই সব তুচ্ছ টাকাকড়ির কথা বলে।

সত্যি কথা বলতে কি, লালুর ইদানীংকার ব্যবহার ও চালচলনে ভুতোর মা মনে মনে একটু যেন ক্ষুণ্ণই হয়েছিল। সমস্ত দায়-ভাবনা ভুলুর ঘাড়ে নির্বিবাদে চাপিয়ে দিয়ে সে পড়াশুনা নিয়েই মত্ত। শুধু তাই নয়, তার সাজপোশাকও আজকাল অনেক বদল হয়েছে। সপ্তাহে একবার করে ডাইংক্লিনিং থেকে জামা-কাপড় ধুয়ে আসে এবং পড়াশুনা নিয়েই সে সর্বদা কাটায়। আর ভুলু কোনোমতে, দুটি শাকান্ন

খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। লালু যেন আগের লালু আর নেই। শুধু তাই নয়, আজকাল লালুর চোখে কেমন একটা লোভ ও ঘৃণার দৃষ্টি। আগে বসে বসে কত সুখদুঃখের কথা বলত, এখন কথা বলা তো দূরে থাক্, দেখা হলে কেমন যেন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে লালু। মাসী আজ তাই একটা কথা ভুলুকে না বলে থাকতে পারে না।

একটা কথা বলব ভুলু ?

কি মাসী ?

নিজে এত কষ্ট করে লালুর জন্য তুই—

ছি, ছি মাসী, অমন কথা বোলো না। ও যদি ঘুণাক্ষরেও এ-সব কথা শুনতে পায়, কত দুঃখ পাবে বল তো ! আমার কথা ভাবছ কেন মাসী ? তোমাদের সকলের আশীর্বাদে অন্ধ হয়েও আমার দিন তো একরকম কেটে যাচ্ছে। ভেবে দেখো আমার মতো কত অন্ধ ব্যর্থ জীবন নিয়ে হাহাকার করে ফিরছে।

কিন্তু—

না মাসী, না। অন্ধ হয়ে গেলাম ভাগ্যদোষে। যার চোখই নেই মাসী, তার তো কিছুই নেই। তবু অন্ধ হয়েও এই যে লালুর মতো এক খঞ্জর এতটুকু সাহায্য করতে পারছি, তাকে বাঁচবার পথে এগিয়ে দিতে পারছি, এর চাইতে আর সুখের কথা আমার কি থাকতে পারে বল ? আর আমি কিছু চাই না মাসী, মানুষ হয়ে লালু যদি আমার মুখের দিকে নাও ফিরে চায়, তবু তো আমার এই সান্ত্বনাটুকু থাকবে, সমস্ত হারিয়ে কারও একটুকু সাহায্য না নিয়েও সত্যিকারের শ্রম ও চেষ্টায় আমাদের মতো অসহায় একজনও অন্তত জীবনে বাঁচবার পথ খুঁজে পেয়েছে। জান মাসী, বাবা বলতেন— তুচ্ছ স্বার্থের জন্য যে মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দেয় তার মতো হতভাগ্য জগতে আর কেউ নেই।

প্রাণে ধরে তথাপি ভুতোর মা ভুলুর দেওয়া আংটিটা বেচতে পারল না। নিজের সামান্য পুঁজি থেকে কিছু টাকা বের করে

চাল ডাল নিয়ে এল। আর বার বার সেই অদেখা ভগবানকে স্মরণ করে বলতে লাগল মনে মনে, ভগবান, এত বড় একটা মহৎ প্রাণ যাকে দিলে তার চোখ দুটি এমনি করে নিষ্ঠুরের মত৷ অকালে কেড়ে নিলে কেন? এ তোমার কেমন বিচার?

লালু সত্যি-সত্যিই পরীক্ষায় সেবারে প্রত্যেকটি বিষয়ে শতকরা আশির ঘরে নম্বর পেয়ে ক্লাসে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করল এবং লালুর সাফল্যে সর্বাপেক্ষা আনন্দ পেলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অপুত্রক কুলদাবাবু। টিফিনের সময় তিনি লালুকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বললেন, লালু, তোমার সাফল্যে আমি যে কি খুশী হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তোমাকে একটা কথা বলব, অবিশ্যি যদি মনে কিছু না কর।

ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না স্যার। আপনাদের দয়া না পেলে হয়তো এ জীবনটা আমার পথের আবর্জনার মধ্যেই কেটে যেত।

কুলদাবাবু বললেন, না, না—ওকথা বলো না, মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছাই তাকে তার সাফল্যের পথে নিয়ে যায়। তোমার ভিতরে যে ইচ্ছা ছিল সেই ইচ্ছার জোরে তুমি তোমার পথ খুঁজে পেয়েছ। আমি তো সামান্য নিমিত্ত মাত্র। তারপর একটু থেমে বললেন, হ্যাঁ, যেজন্য তোমাকে ডেকে এনেছি, শোনো লালু, আমার ইচ্ছা তোমার যখন আপনার জন আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, তুমি আর বস্তিতে থেকো না। আমার বাসায় চলে এসো, আমার ছেলেমেয়ে কেউ নেই—তুমি আমার ছেলের মতোই আমার বাসায় থাকবে। কি বল?

আপনার স্নেহের তুলনা নেই স্যার। কিন্তু—

না, না—এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু নেই। কালই তুমি চলে এসো। এক কাজ করো, স্কুল থেকেই একসঙ্গে কাল আমার

বাসায় যাওয়া যাবে, কি বল? তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এসে দারোয়ানের ঘরে রেখে দিও।

কুলদাবাবুর প্রস্তাবে লালু যে ঠিক কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। অচিন্তনীয় এক আনন্দের উচ্ছ্বাসে যেন তার চোখের কোণে জল এসে যায়।

কুলদাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সত্যি, লালু কুলদাবাবুর প্রস্তাবে যেন হাতে স্বর্গ পায়। ভগবান যে এমনি করে তার বস্তি-জীবনের লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি দেবেন এ সে ভাবতেই পারে নি। অথচ আশ্চর্য! একবারও তার ভুলুর কথা মনে হল না। আজকের এই সাফল্যের দরজায় সে পৌঁছিতে পেরেছে যার ত্যাগে ও দয়ায়, একবারও তার কথা কিন্তু ঐ মুহূর্তটিতে মনে পড়ল না।

মনে পড়ল না একবারও, কে তাকে দিনের পর দিন রাস্তার ধারে বসে গান গেয়ে উপার্জন করে তার সাফল্যের রসদ যুগিয়েছে এই একটা বছর। বাড়ি ফিরে এসে দেখলে, ভুলু শয্যায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে। আজ কদিন থেকেই তার গলায় কেমন একটা ব্যথা অনুভব করছিল ভুলু। গান গাইতে কষ্ট হচ্ছিল। তার উপরে গত পরশু থেকে সন্ধ্যার দিকে একটু একটু জ্বরও যেন আসছে।

ভুলু লালুর পায়ের শব্দে প্রশ্ন করে, লালু ফিরলি ভাই।

হ্যাঁ—তুই শুয়ে যে এ সময়? বেরোস নি?

না। তোর পরীক্ষার ফল বেরুল?

হ্যাঁ, ফার্স্ট হয়েছি।

॥ সতেরো ॥

সত্যি ! সত্যি পরীক্ষায় তুই ফার্স্ট হয়েছিস ?

আনন্দে উত্তেজনায় ভুলু তার শরীবের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে জীর্ণ মলিন শয্যার উপরে উঠে বসল।

বাইরে থেকে তাকিয়ে এতটুকু বোঝবার উপায় নাই যে ভুলু অন্ধ! সে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন! হরিণের চোখের মতো কালো দুটি চোখের ওপরে এ জগতের সমস্ত আলো যে নিবে গিয়েছে, কেউ বুঝতে পারবে না তার চোখের দিকে তাকালে। বিশেষ করে যখন সে কারো দিকে চেয়ে থাকে তখন মনে হয় অমন দুটি ছলো-ছলো কৃষ্ণকালো চোখের বুঝি জোড়া মেলে না কোথাও। শয্যার ওপরে উঠে বসে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে ভুলু, মাসী ! মাসী !

ডাক শুনে পাশের ঘর থেকে ভূতোব মা ছুটে আসে।

কি রে? কি হল?

মাসী! শুনেছ মাসী, লালু পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে! আমি বলি নি মাসী, তোমায় আমি বলি নি, লালু মস্ত বড় লোক হবে? দেখো মাসী, দেখো, ও হাইকোর্টের জজ হবে। মনের আনন্দ যেন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ভুলুর ছোট্ট কিশোর হৃদয়টি ছাপিয়ে যায়।

ভুলুর ঐ আনন্দ-বন্যায় লালু যেন আর সাড়া দিতে পারে না। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা কিন্তু সংকোচের কাঁটা কিচকিচ করে বিঁধতে থাকে। স্থাণুর মতোই নির্বাক লালু দাঁড়িয়ে থাকে। মাসীও নির্বাক। ভুলু তখনো যেন নিজের আনন্দেই বলে চলেছে।

এক কাজ করো মাসী, বাজার থেকে আজ ভালো মাছ নিয়ে এসো, লালুকে আজ ভালো করে খাওয়াও!

ভূতোর মা বলতে পারে না যে, তার হাতে সামান্যই খরচা

অবশিষ্ট আছে।

গরীব দুঃখীর ঘরে এক-একদিন এটা-ওটা খুশিমতো খেতে গেলে দুদিন উপোস দিতে হয়। বাহুল্য প্রয়োজনে টান ধরায়।

লালু যেন নিজেকে কেমন অপরাধী বোধ করতে থাকে। ভুলুর আনন্দের মাঝখানে যখন সে তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি তার আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে হেডমাস্টার মশাইয়ের প্রস্তাবের কথাটাও তুলতে লালু যেন কেমন সংকোচ বোধ করে। ভুলুকে ছেড়ে চলে যাবার কথাটা বলতে মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা তাকে পিছন দিকে টানতে থাকে হঠাৎ।

এমন সময় বাইরে বস্তির মধ্যে একটা গোলমাল শোনা যায়।

ব্যাপার কি দেখবার জন্য লালু বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

বস্তি-জীবনের নোংরা আবহাওয়ার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা!

লালু-ভুলুদেরই বয়সী একটি ছেলে মানিক বড় রাস্তার উপরে একটা রেস্টুরেন্টে ছোকরা চাকরের কাজ করে। অশিক্ষা ও বস্তি-জীবনের নোংরামিতে মানিক এই বয়সেই হয়ে উঠেছে চোর। রেস্টুরেন্টের ক্যাশ থেকে টাকা চুরি করে কয়েকদিন হল মানিক গা ঢাকা দিয়েছিল। মালিক পুলিসে খবর দিয়ে নজর রেখেছিল। পাঁচ দিন বাদে আজ হাতের পয়সা ফুরিয়ে গিয়ে বস্তিতে আবার ফিরে এসেছে মানিক। পুলিস টের পেয়ে এসে মানিককে ধরেছে আর তাই নিয়েই মানিকের মা-বাবার সঙ্গে পুলিস ও রেস্টুরেন্টের মালিকের সঙ্গে বেধেছে বচসা। জঘন্য কুৎসিত গালাগালি ও চেঁচামেচি তারা শুরু করেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরে লালু যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়। এরাই তার প্রতিবেশী। এদের সঙ্গেই তার দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটছে।

মানিক চালাক ছেলে, এই বয়সেই [illegible] রকমের দুষ্কৃতি করে

একেবারে পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। এবং শুধু তাই নয়, নিজে ধরা পড়ে সে বস্তির মধ্যে তার সমবয়সী আরও দু-চারজনকেও জড়িয়েছে।

এমন সময় লালুকে সামনে এসে দাড়াতে দেখে বলে ওঠে, ঐ লালু—ও ও তো আছে আমাদের দলে। সে টাকায় ওই লালুও ভাগ বসিয়েছে।

লালুকে জড়াবার আরও একটু কারণ ছিল মানিকের। লালু তাকে ঘৃণা করত এবং কখনও মানিকের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না।

মানিকের পাশে পটলা, সিধু ও গোবরাকে পুলিস ধরে দাঁড় করিয়েছিল। এখন মানিকের কথায় পুলিস অফিসারটি এগিয়ে গিয়ে লালুরও হাত চেপে ধরে রুক্ষ কণ্ঠে বলে ওঠেন, এই তুইও চল।

আমি! আমি কেন যাব? রুখে দাড়ায় লালু।

রেস্টুরেন্টের মালিক যতীন দত্ত বলে ওঠে, একটা গ্যাং বুঝলেন স্যার—একটা রীতিমত গ্যাং ওদের আছে। এদের অসাধ্য কিছু নেই। চুরি, জোচ্চোরি, পকেটমার থেকে সব কিছুতে এরা পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে এই বয়সেই।

লালুর কোনো ওজর-আপত্তিই পুলিস অফিসারটি শুনলেন না। মানিকের দলের সঙ্গে লালুকেও ধরে নিয়ে গেলেন থানায়।

থানায় পৌঁছে থানার বড়বাবুকে লালু বললে, আমি এদের দলের কিছু জানি না। এদের সঙ্গে জীবনে আমি কখনো মিশি নি। অবস্থার জন্য বস্তিতে থাকি বটে, কিন্তু হরনাথ স্কুলে আমি পড়ি। সেখানকার হেডমাস্টার কুলদাবাবুর কাছে গেলেই আমার সব কথা জানতে পারবেন আপনি।

থানার বড়বাবু অমিয় সেন বিচক্ষণ অফিসার। সব শুনে বললেন, বেশ, তাই যদি হয় খালাস পাবে। আজ রাত তো হাজতে থাকো।

হাজত-ঘরে সব কয়েকজনকে একসঙ্গে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে রাখা হল।

মানিক লালুকে মুখ ভেংচে বক দেখিয়ে বলে, আহা! চুক চুক চুক—স্কুলের বাবু রে আমার! এবারে পড়ো বাবা পড়ো—ঐক্য মাণিক্য! কখনো কাহাকে কুবাক্য বলিও না, চুরি করা মহা দোষ!

রাগে দুঃখে অপমানে লালুর চোখে জল এসে যায়। সে গুম হয়ে থাকে। সারাটা রাত্রি ধরে তাকে নিয়ে অন্যান্য সকলে কুৎসিত ঠাট্টা-তামাশা করতে থাকে। পরের দিন সকালে কুলদাবাবু অমিয়-বাবুর মুখে সংবাদ পেয়ে থানায় ছুটে এলেন এবং নিজে লালুর মুখে সব শুনে জামিন হয়ে লালুকে খালাস করে একেবারে সোজা নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন।

ওদিকে বেলা দশটা নাগাদ অন্ধ ভুলু ভূতোর মাকে সঙ্গে করে নিয়ে যখন লালুর খোঁজে থানায় এল, শুনল ঘণ্টাখানেক আগে লালুর স্কুলের হেডমাস্টার মশাই নিজে এসে লালুকে খালাস করে নিয়ে গিয়েছেন, নিজে জামিন হয়ে।

থানা থেকেই ভুলু লালুর ঠিকানা জেনে নিল। সে প্রথমে ভাবল এতক্ষণ হয়তো লালু বস্তিতেই ফিরে গিয়েছে, কিন্তু সেখানে ফিরে এসে শুনল লালু সেখানে ফেরে নি।

সারাটা দিন অপেক্ষা করেও যখন লালু বস্তিতে ফিরল না, ভুলু আর বসে থাকতে পারল না। ভূতোর মাকে নিয়ে পটলডাঙায় কুলদাবাবুর বাড়ির দিকে চলল। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে ঠিকানা খুঁজে অন্ধ ভুলু আর ভূতোর মা যখন কুলদাবাবুর দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, বাইরের ঘরের জানালা-পথে লালু তাদের দেখতে পেয়ে জানালাটা তাড়াতাড়ি এঁটে দিল। কুলদাবাবু ঐ ঘরের মধ্যেই ছিলেন, জানালা বন্ধ করতে দেখে তিনি শুধালেন, কী হল ললিত?

আমার সেই বস্তির লোকেরা আমাকে নিতে এসেছে। আপনি

ওদের বলে দিন. আমি যাব না।

এদিকে দরজার কড়া নাড়তেই কুলদাবাবু দরজা খুলে এসে বললেন, কি চাই ?

এটাই তো কুলদাবাবুর বাড়ি! ভুলু বলে।

হ্যাঁ। কি চাও ?

লালু এখানে আছে ? তাকে একটু ডেকে দেবেন ?

না। তার সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে না! সে এখানেই থাকবে!

সে এখানে থাকবে ?

হ্যাঁ।

একটিবার তার সঙ্গে দেখা হয় না ? বলুন না তাকে—ভুলু এসেছে!

না, না কুলদাবাবু ওদের মুখের উপরেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন; দেখা হবে না. যাও।

॥ আঠারো ॥

মুখের উপরে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল একটা শব্দ তুলে। তবু কিন্তু ভুলু সেখান থেকে নড়তে পারে না। প্রায় দেড় বছর আগে একান্ত আকস্মিকভাবেই পথের মাঝখানে লালুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমেই সেই পরিচয় দুটি অপাপবিদ্ধ কিশোর হৃদয়কে একান্তভাবেই আপন করে দিয়েছিল পরস্পরের প্রতি নিবিড় ভালোবাসায়। অন্ধ ভুলু, তার পরিচয়ের সীমাটা ছিল কণ্ঠস্বর ও স্পর্শের ভিতর দিয়েই। লালু কেমন দেখতে তা সে কোনো দিনই জানতে পারে নি। কিন্তু লালুকে চোখে না দেখতে পেলেও ভুলুর মনে কোনো ক্ষোভ ও দুঃখ ছিল না। তার কারণ তার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই লালুকে সে তিলে তিলে আপনার বুকের

মধ্যে নিবিড় করে পেয়েছিল।

লালু, ভুলুর কাছে শুধু একান্ত ভালোবাসারই জন ছিল না। সে ছিল তার সব চাইতে বড় অবলম্বন, বন্ধু, আত্মীয়—আপনার জন।

পৃথিবীর শেষ সম্বল পিতা ও মাতাকে হারিয়ে চিরদিনের আশ্রয়চ্যুত ভুলু একমাত্র দিদির ভরসায় পরম দুঃসাহসে যেদিন এই কলকাতা শহরে এসে দিশেহারার মতো হাতড়ে হাতড়ে ফিরছে, খোঁড়া লালু এসে তার হাত ধরেছিল।

তাই সে তার ব্যর্থ জীবনকে আবার নতুন করে লালুকে দিয়েই গড়ে নিতে চেয়েছিল। নিজেকে তাই লালুর জন্য নিঃস্ব করে দিতে কোনো কার্পণ্য করে নি।

যে আশা তার জীবনে আর কোনো দিনই মেটবার নয়, সে আশা যদি লালুর মধ্যে দিয়ে তার মেটে এই আকাঙ্ক্ষাতেই না সে নিজের সমস্ত বঞ্চনার মধ্যে দিয়েও লালুর মুখের দিকে চেয়েছিল সতৃষ্ণ অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে,—পরম আশ্বাসে, পরম নির্ভরতায়!

এবং বিশেষ করে এ সংসারের একমাত্র ও শেষ অবলম্বন নিজের মায়ের পেটের বোন বীণাও সেদিন যখন অতর্কিতে তাকে পথের মধ্যে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল, প্রথমটায় সেই অতর্কিত অভাবিত চরম আঘাত বুকখানাকে তার ক্ষতবিক্ষত করে দিলেও, ঘুণাক্ষরেও সে কথা সে প্রকাশ করে নি শুধু মাত্র লালু তার পাশে আছে বলেই না? সেই লালু আজ তাকে অবহেলায় চিরদিনের মতো ত্যাগ করে তার মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিল?

কুলদাবাবু দরজা বন্ধ করেন নি। করেছিল লালুই।

কুলদাবাবু নতুন করে আর কি দরজা বন্ধ করবেন? তাঁরা তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন ভুলুদের মুখের উপরে অনেক দিন আগেই?

বহুকাল পরে অন্ধ ভুলুর দু'চোখের কোণ বেয়ে জল নেমে এল।

সত্যি-সত্যিই লালু তা হলে তাকে ত্যাগ করে চিরদিনের মতো চলে গেল আজ!

স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকেই কিছুদিন যাবৎ লালুর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিলেও ভুলু কখনো ভাবতে পারে নি—লালু শেষ পর্যন্ত তাকে এমনিভাবে পথের মধ্যে একলা ফেলে চলে যাবে। লালু এমনি করে সত্যি সত্যিই তাকে ভুলে যাবে।

হঠাৎ ভূতোর মার স্পর্শে ভুলু চমকে উঠল।

বাড়ি চলো ভুলু।

হ্যাঁ মাসী, চলো।

ভুলু যাবার জন্য পা বাড়াল।

তুই দুঃখ পাবি তাই এতদিন তোকে বলি নি ভুলু। লালু যে আর থাকবে না তা আমি অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, মাসী মৃদুকণ্ঠে বললে।

কিন্তু ওর তো কোনো দুঃখই ছিল না মাসী, তবে ও চলে গেল কেন? সমস্ত দুঃখ ও লজ্জা থেকেই তো ওকে আমি আড়াল করে রেখেছিলাম। একটি আঁচড়ও তো ওর গায়ে আমি লাগতে দিই নি।

স্বার্থপর। স্বার্থপর—নইলে ছেড়ে যায়!

স্বার্থপর। না মাসী, ও কথা বোলো না। তুমি তো জান না, আমি জানি, মানুষ হয়ে ওঠবার জন্য ওর কী সাধনা, কী আপ্রাণ চেষ্টা। এখানে আমাদের ঐ বস্তির সংকীর্ণ নোংরা জীবনের মধ্যে ও সত্যিই হাঁপিয়ে উঠছিল মাসী। ভালোই হল। হয়তো এবারে ও সত্যি সত্যিই মানুষ হয়ে উঠতে পারবে।

মানুষ হয়ে উঠবে না ছাই। এমনি করে তোর মতো বন্ধুকে যে ভুলে যেতে পারে তাকে ভগবানই ক্ষমা করবেন না।

না। না মাসী। অমন কথা বোলো না, ও বড় দুঃখী। সত্যি-কারের দুঃখের যে কী জ্বালা আমি জানি তো মাসী। ভালোই হল। কুলদাবাবুর আশ্রয়ে ও বাঁচতে পারবে। আর সত্যিই তো। ওকে মানুষ করে তোলবার ক্ষমতাই বা আমাদের কোথায়।

আশ্চর্য হয়ে যায় ভূতোর মা। কণ্ঠ দিয়ে তার একটি শব্দও বের

হয় না। ধীরে ধীরে ওরা পথ চলতে থাকে।

আর লালু!

কুলদাবাবু যখন সত্যি সত্যিই বাইরের ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, দুম করে যেন ওর বুকের মধ্যে একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল।

ভুলুর শেষ কথাগুলো যেন তখনও তার কানের মধ্যে ঝমঝম করে বাজছে।

একটিবার ওর সঙ্গে দেখা হয় না? বলুন না তাকে, ভুলু এসেছে!

ভুলুর সঙ্গে ভুতোর মাকে লালু আগেই দেখতে পেয়েছিল। অন্ধ ভুলুর দৃষ্টিকে এড়াতে পারলেও মাসীর চোখের দৃষ্টিকে তো এড়াতে পারবে না। তাই রাস্তার ধারের ঘরের জানালাটা একটু ফাঁক করে লালু দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাসী ভুলুকে যেন কী বললে। তারপর তারা চলতে শুরু করল যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই।

ক্রমে ক্রমে দুজনে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

ভুলু আর মাসী চলে গেল।

ধীরে ধীরে লালু জানালাটা আবার সম্পূর্ণ খুলে দিল, কিন্তু তারা চলে গেছে। আর এ পথে তারা আসবে না।

ঐ পথ ধরেই তার দুঃখের জীবনের পরম বন্ধুটি চলে গেল, আর সে ফিরবে না। হঠাৎ এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে একটা কর্কশ নারীকণ্ঠের উক্তি তার কানে এসে যেন তপ্ত শলাকার মতো বিদ্ধ হল।

পথের জঞ্জাল তো ঘরে এনে তুললে, ঠেলা সামলাবে তুমি—মনে থাকে যেন!

আঃ সুধা, চুপ করো। চুপ করো, পাশের ঘরে আছে, শুনতে পাবে। প্রত্যুত্তর দিলেন মাস্টারমশাই কুলদাবাবু।

কেন! চুপ করব কেন শুনি! কোথাকার কে এক চোর,

হাজত থেকে ছাড়িয়ে এনে আদ্দিখ্যেতা করবার কী দরকার ছিল শুনি!

কেন মিথ্যে চেঁচাচ্ছ, ও চোর নয়।

না! চোর নয়, মিথ্যে মিথ্যে ওকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল! তোমার যেমন বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে ধরেছে!

পাথরের মতোই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লালু।

এ সে কোথায় এসে পড়ল!

কতক্ষণ স্থাণুর মতো দাড়িয়েছিল লালু তার মনে নেই, হঠাৎ কুলদাবাবুর কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙল।

স্নান করে নাও ললিত, খেয়েদেয়ে আমার সঙ্গে স্কুলে যাবে।

হঠাৎ লালুর দু চোখের কোণ বেয়ে ঝরঝর করে জল নেমে আসে।

ও কি! কাঁদছ কেন ললিত! ও বুঝেছি, আমার স্ত্রীর কথাগুলো বুঝি তোমার কানে এসেছে! কিছু ভেবো না ললিত, আমি যখন তোমাকে এ বাড়িতে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি—আমিই তোমাকে আগলে রাখব। তা ছাড়া, সত্যিই উনি আসলে খারাপ নন, পরে দেখবে।

॥ উনিশ ॥

কুলদাবাবু মুখে যাই বলুন না কেন এবং এই কয় মাসের ঘনিষ্ঠতায় ও স্নেহে কুলদাবাবুর সহৃদয়তার যে পরিচয়ই পাক না কেন লালু, অন্তরাল থেকে তার সম্পর্কে উচ্চারিত কুলদাবাবুর স্ত্রীর মন্তব্যগুলো যেন লালুর হৃদয়ে শেলের মতোই বিদ্ধ হয়ে থাকে। কিছুতেই কুলদা-বাবুর স্ত্রীর কথাগুলো সে যেন ভুলতে পারে না।

এই অল্প বয়সে পৃথিবীর মানুষের যে পরিচয় সে পেয়েছে তা থেকে এইটুকু বুঝবার ক্ষমতা তার হয়েছে যে, কুলদাবাবুর কাছে যত

স্নেহ ও ভালোবাসাই সে পাক না কেন, তাঁর স্ত্রী লালুকে কোনো মতেই আপনার করে নিতে পারবেন না।

সেখান থেকে মুহুর্মুহু আঘাত আসবেই।

তবু লালুর মনে হয়, তা আসুক। বস্তিজীবনের পঙ্কিলতা ও নোংরা আবহাওয়া থেকে তো সে মুক্তি পেয়েছে।

ওখানকার অশিক্ষা কদর্যতা কুরুচি যেন নিশ্বাসকে চেপে ধরে। ওখানে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল, যতই সে উঠবার চেষ্টা করুক না কেন, ওরা তাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না। পিছন থেকে জোর করে টেনে ধরে থাকবে। এগিয়ে যেতে দেবে না।

তা ছাড়া ভুলু।

ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে নিজেকে কোনোমেতে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা। সমাজ-জীবনের আলো-বাতাসহীন অন্ধকার কুঠরির মধ্যে পলে পলে জীবনকে খুইয়ে ফেলা—মাথা নিচু করে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সমস্ত অবিচার ও অবহেলাকে হাসিমুখে সহ্য করে যাবার ভুলুর দুর্বলতা, এ যেন কিছুতেই ইদানীং লালু সহ্য করতে পারছিল না। কেন যেন তার মনে হচ্ছিল, এর মধ্যে কোনো গৌরব নেই, কোনো সম্মান নেই, কোনো বাহাদুরি নেই।

এমনি সহ্য করে করেই এদেশের সমাজ-জীবনের একটা পৃষ্ঠা, মানুষের জীবন-ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা কালো হয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে।

মানুষের সহানুভূতির দৃষ্টি ও দাক্ষিণ্যের সহজলভ্য হাতটা ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে না।

আজকের ওদের এ দুর্দশার জন্য কেবল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাই পুরোপুরি দায়ী নয়, দুর্বলতাও অনেকখানি দায়ী।

আর ভুলু সেই দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে।

লালু নিজে থেকে এতটা বুঝতে পারত কিনা সন্দেহ। এবং কোনোদিন এ ধরনের কথা তার মনে আসত কিনা সন্দেহ। এসব

কুলদাবাবুরই কথা।

কুলদাবাবুই তাকে এসব কথা বলেছেন।

ভুলু ফিরে এল ভুতোর মার সঙ্গে তাদের সেই বস্তির অন্ধকার ঘরে।

কয়েকদিন ধরে একটু একটু জ্বর হচ্ছিল, পা দুটো যেন ভেঙে আসে।

ভুলু ঘরে ঢুকে মাদুরটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

এক-আধদিন তো নয়, প্রায় দেড় বছরের উপরে ওরা দুজনে একত্রে এই ঘরে ছিল।

প্রথম দিনের আকস্মিক সেই পরিচয়ের মুহূর্তটি থেকে কতদিনের কত কথাই না ভুলুব মনের মধ্যে আনাগোনা করে।

নিষ্ঠুর ভাগ্য তাকে এই মহানগরীব পথের মধ্যে এনে নিঃসহায় নিঃসম্বল করে ফেলে দিয়েছিল। এমন সময় পাশে সে পেল লালুকে, তার অন্ধ ব্যর্থ জীবনকে সে যে কিছুটা সার্থক করে তুলতে চেয়েছিল তা ঐ লালুব মধ্যে দিয়েই। সেই লালু আজ তাকে ছেড়ে চলে গেল। ইদানীং লালুর ব্যবহারে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিলেও কখনও ভুলু ভাবে নি, সত্যি সত্যি লালু তাকে এমনি করে একদিন একা ফেলে চলে যেতে পারবে।

এখন সে কি নিয়ে বাঁচবে।

অন্ধ, দেখতে পায় না সত্য, ঘরটা তার খালি হয়ে গেছে, কিন্তু মনটাও যে একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল আজ।

সব খালি, শূন্য। সব যেন কেমন ব্যর্থ, মিথ্যা মনে হয়।

তবু মনে মনে ভুলু বলে, লালু যেখানেই গেছে, সুখে থাক্। সে বড় হোক, সে বেঁচে থাক্।

সত্যিই তো, এখানকার এই বস্তির লোকদের মতো বেঁচে থেকে লাভ কী!

সারাটা দিন ভুলু ঘর থেকে বের হল না। রাত্রে কাজ থেকে ফিরে ভুতোর মা দেখল, ভুলু তেমনই ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে চুপটি করে।

কিরে ভুলু, বেব হস নি আজ ?

না মাসী।

পবেব দিন এবং তাব পরের দিনও যখন ভুলু বের হল না, ভূতোর মা এসে বললে, অমনি কবে ভূতেব মতো দিনরাত ঘরের মধ্যে পড়ে থাকলে যে মবে যাবি বে! কেন তুই সেই নেমকহারামটার কথা ভাবছিস! ভদ্দরলোকেব হাওয়া গায়ে লেগেছে, ফরসা জামা-কাপড় গায়ে উঠেছে তাব—সে কি আর এখানে থাকতে পারে রে!

ভুলু ভূতোব মার কথাব কোনো জবাব দেয় না। চুপ কবে থাকে।

তার পরের দিন থেকে আবাব সন্ধ্যাবেলা গান গেয়ে ভিক্ষা করতে বের হয়।

কিন্তু গান গাইতে গাইতে হঠাৎ আনমনা হয়ে থেমে যায় ভুলু। মিনিটের পর মিনিট চুপচাপ বসে থাকে।

কথা হারিয়ে যায়, সুব ভুল হয়ে যায়।

তা ছাড়া গলাটাও আজকাল কেমন যেন একটু বেশিক্ষণ গাইলেই ব্যথা-ব্যথা করে।

আগে যেমন রোজগার করে জমানোর একটা উগ্র ইচ্ছা ছিল, এখন আর সেটা নেই। যা হোক কিছু রোজগার হলে ধীরে ধীরে লাঠিটা হাতে করে ঠুকঠুক করে বাসার দিকে চলতে শুরু করে। মধ্যে মধ্যে একটা বহু-পরিচিত ক্রাচের খটখট শব্দ শুনবার আশায় কানটা তার উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

কিন্তু সে পরিচিত শব্দটা যেন বিশ্বের মধ্যে হৈ হট্টগোলের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। চারিদিককার অবিশ্রান্ত মিশ্র বহুবিধ শব্দ যেন বিশেষ একটি পরিচিত শব্দকে নিঃশেষে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে।

ওদিকে লালু দুদিনেই বুঝতে পারল যে আশ্রয় তার আজ মিলেছে সে আশ্রয়ের জন্য তাকে রীতিমত মূল্য দিতে হবে।

কুলদাবাবুর স্ত্রী সুধা দেবী একেবারে নিঃস্বার্থভাবে তাকে খেতে পরতে দেবেন না। প্রথমে প্রথমে একটু-আধটু ছোটখাটো ফাই-ফরমাশ, তারপর ক্রমে শুরু হল প্রত্যহ বাজার করা, স্নানের পর বাথরুম থেকে জামাকাপড়গুলো কেচে মেলে দেওয়া, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করা, অনেক কিছুই। স্কুলের শেষে কুলদাবাবু চলে যান টিউশানি করতে। দু জায়গায় টিউশানি শেষ করে ফিরতে তাঁর রাত সাড়ে নটা দশটা হয়। সেই সময়টাতেই যত কাজ করিয়ে নেন সুধা দেবী লালুকে দিয়ে। রাতের খাওয়াও তাকে কুলদাবাবুর পর সুধা দেবীর খাবার পর খেতে হয়। সে অন্ন দেখলেই বোঝা যায় কতখানি তাচ্ছিল্যের অন্ন সে। স্কুল থেকে ফিরে ফাইফরমাশ খেটে পড়তে বসতে বসতে রাত নটা বেজে যায়। ক্লান্তিতে তখন দুচোখের পাতা বুজে আসে। লালু আসবার আগে যে চাকরটি এসব কাজ করত, লালু এ বাড়িতে আসবার দিন সাতেক পরেই তাকে মাইনে চুকিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কাজ লালু কখনও করে নি, তাই প্রথম প্রথম তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। কিন্তু সে মুখ ফুটে কুলদাবাবুকে কোনো কথা বলতে পারত না এবং ও-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও পারত না। কুলদা-বাবুকে বলতে পারত না লজ্জায়, সংকোচে। কী তিনি ভাববেন। তা ছাড়া আবার মনে হত, সত্যিই তো কে সে তাদের যে, বিনি পয়সায় এমনি করে তাকে তাঁরা থাকতে খেতে ও স্কুলে পড়তে দেবেন। আর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও পারত না। কোথায়ই বা সে যাবে? যাওয়ার একমাত্র স্থান তো সেই ভুলুর আশ্রয়; কিন্তু কোন্ মুখ নিয়ে আবার সে ভুলুর আশ্রয়ে ফিরে যাবে। ভুলু যদি হেসে ওঠে? না। না—তার চাইতে এই ভালো। এই ভালো।

কিন্তু যেজন্য সে বস্তি ছেড়ে ভুলুকে ত্যাগ করে চলে এল সেই লেখাপড়া করবারও তো সময় পাচ্ছে না। ক্রমে যত দিন যায় ভুলুর আশ্রয়, তার সেই নিঃস্বার্থ সেবা, নিজেকে বঞ্চিত করে সর্বতোভাবে

তার মঙ্গল কামনা লালুর মনকে চঞ্চল অস্থির করে তোলে।

হঠাৎ রাত্রে ঘুমের মধ্যে যেন কানে ভেসে আসে ভুলুর সেই চিরপরিচিত মিষ্টি গানের সুরটা।

রাত্রে পড়ার বই খুলে পড়তে পড়তে মনে পড়ে, এখন হয়তো কলেজ স্কোয়ারে ফুটপাথের ধারে বসে ভুলু গান গেয়ে ভিক্ষা করছে।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে রাত নটা বাজলেই চমকে ওঠে। ভুলুর ফেরবার সময় হল।

কখনও কখনও মনে হয়, চুপিচুপি গিয়ে দূর থেকে একটিবার ভুলুকে দেখে আসবে। কিন্তু সাহস হয় না।

তার ক্রাচের শব্দ ভুলু যে বিশেষভাবেই চেনে। সে ঠিক ধরে ফেলবে।

এদিকে দেখতে দেখতে পরীক্ষাও এসে গেল।

॥ কুড়ি ॥

চিরদিনের যে জায়গাটিতে বসে ভুলু গান গেয়ে ভিক্ষা করত এখন আর সেখানে সে বসে না ইচ্ছা করেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে বেড়ায় এখানে ওখানে।

হাতে একটি লাঠি। তারই সাহায্যে পায়ে চলার পথটা অনুভব করে করে চলে গান গেয়ে গেয়ে। তবে পরিচিত এলাকার বাইরে বড় একটা যায় না পাছে পথ ভুলে ঘুরে মরে।

পথচারী কেউ কেউ কখনো থমকে দাঁড়ায়, দয়াপরবশ হয়ে পয়সা তুলে দেয় অন্ধ কিশোরটির হাতে, খোকা, এই নাও পয়সা।

হাত পেতে পয়সাটা নিতে নিতে বলে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

এমনি করেই একদিন গান গাইতে গাইতে ভুলু সেই লালবাড়ির

সামনে এসে দাঁড়াল অনেক দিন পরে আবার।

পায়ের পাতার স্পর্শের ভিতর দিয়ে ভুলু রাস্তাটা চিনতে পারে।

মনে পড়ে যায় সেই হারানো রাজপুত্তুরকে।

আপনা থেকেই কণ্ঠ দিয়ে বের হয়ে আসে সেই পুরাতন গানটি।

ওগো সোনার দেশের রাজার কুমার
শুনতে কি গো পাও।

ঠিক ঐ সময় লালবাড়ির দোতলায় একটি ঘরে মণিকা তার বান্ধবী বীণার সঙ্গে বসে গল্প করছিল। অনেক দিক বাদে বীণা এসেছে তার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে।

দুজনে হেসে হেসে গল্প করছিল হঠাৎ এমন সময় রাস্তার দিককার খোলা জানালা-পথে ভেসে এল ভুলুর গানের সুর।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে মণিকা।

বীণাও যে সেই গানের সুরে চমকে ওঠে নি তা নয়।

তারও বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠেছিল সেই গানের সুরে।

কয়েক মাস আগে এক বান্ধবী সুমিতার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাথের ধারে ভুলুকে গাইতে শুনে সেই বান্ধবী যখন ভুলুর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য দাঁড়িয়েছিল, বীণার ভুলুকে দেখে হঠাৎ প্রথমটায় তার মলিন ছিন্ন বেশভূষায় রাস্তার ধারে চিনতে কষ্ট হলেও তার গলা শুনে ও তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে চিনতে কষ্ট হয় নি পরে।

ভূত দেখার মতোই ভিক্ষুকের বেশে পথের ধারে নিজের মায়ের পেটের ভাই ভুলুকে দেখে চমকে উঠেছিল বীণা।

ভয়ে আতঙ্কে বীণা যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল।

ঘুণাক্ষরেও যদি তার সঙ্গে ভুলুর পরিচয়টা তার বান্ধবী জেনে ফেলে, তাহলে তার আর লজ্জার যে অবধি থাকবে না।

সে বি. এ. পাস, ভদ্রবংশজাত, আপন পরিচয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আজ। তারই মায়ের পেটের ভাই, পরিধানে ছিন্ন মলিন বেশ। আজ

রাস্তায় বসে গান গেয়ে হাত পেতে ভিক্ষা করছে এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে আর কি ও সকলের কাছে মুখ দেখাতে পারবে!

ভয়ে বীণা সত্যিই যেন শিউরে উঠেছিল। তার বান্ধবী যত সেধে সেধে ভুলুর সঙ্গে কথা বলতে চায়, বীণা যেন ততই ভিতরে ভিতরে অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

সেই মুহূর্তে ওখান থেকে সে পালাতে পারলে যেন বাঁচে।

শুধু কি তাই? হঠাৎ যদি বোকা সরল ভুলুটা তার গলা চিনতে পেরে তাকে দিদি বলে ডেকে ওঠে তাহলেই তো কেলেঙ্কারি।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভুলু ডাকে নি তাকে দিদি বলে। বোধ হয় চিনতে পারে নি।

ভূতে তাড়া করার মতোই সেদিন বীণা ভুলুর কাছ থেকে ছুটতে ছুটতে পালিয়েছিল। ট্রামে আর না চেপে একেবারে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে বীণা পানিহাটিতে তার স্কুলের বোর্ডিংয়ে পালিয়ে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

কিন্তু হায়! ট্যাক্সিতে চেপে ঊর্ধ্বশ্বাসে ভুলুর কাছ থেকে পালিয়ে এলেও, নিজের কাছে নিষ্কৃতি মেলে নি বীণার।

একটা অশরীরী ছায়া যেন তখনও তার সামনে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

মলিন শুষ্ক একখানি করুণ মুখ।

দুটি অন্ধ চোখের অসহায় বোবা দৃষ্টি যেন জ্বলন্ত দুটি অগ্নি-গোলকের মতো তার সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একটা নিস্তব্ধ ভাষাহীন কণ্ঠ যেন তার কানের কাছে ঝমঝম করে বাজতে লাগল, দিদি! দিদি!

গ্রামের শেষ সংবাদ যা বীণা পেয়েছিল তাতে সে জেনেছিল বাবা, মা, ছোট বোন রুণু ও ভাই ভুলু সকলেই নৃশংস গুণ্ডাদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছে। কেউ বেঁচে নেই আর।

সংবাদটা শুনে দুদিন বীণা কেঁদেছিল।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন, যাদের কয়েক মাস আগে মৃত জেনে এসেছে, তাদেরই একজন, তার ছোট অন্ধ ভাইটিকে চোখের সামনে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে দেখতে পেল। সেদিন তার সেই চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। প্রায় ভুলে গিয়েছে সে ভুলুকে। এবং কোনো দিন জীবনে যাকে ঐ অবস্থায় দেখবার সম্ভাবনা ছিল না, তাকে ঐ অবস্থায় দেখে তাই তার চোখে নতুন করে আর সেদিন জল আসে নি বরং ফুটে উঠেছিল ভয় একটা আতঙ্ক।

কিন্তু পালিয়ে আসবার পর যতই সে ভুলুর কথা ভাবতে লাগল, ততই যেন ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা সে অনুভব করতে লাগল। বিশেষ করে যখন সে বুঝতে পারল ভুলু তাকে তার গলা শুনেই চিনতে পেরেছিল এবং সে নিজে থেকে তাকে না চিনবার ভান করায় ভুলুও কোনো সাড়া দেয় নি।

রাতের পর রাত ঘুমের মধ্যে ভুলুর মলিন করুণ মুখখানা, তার দৃষ্টিহীন অন্ধ চোখের চাউনি তাকে দুঃস্বপ্নের মতোই যেন তাড়া করে ফিরতে লাগল।

কিন্তু তবু বীণা তার আভিজাত্য ও মর্যাদার খোলসটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভুলুর পাশে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস পেল না।

এমনি করেই বীণা নিজের মনের মধ্যে গুমরে গুমরে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল।

সেদিন অনেকদিন বাদেই বীণা এসেছিল সহপাঠিনী বান্ধবী মণিকার সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে।

মণিকা বীণাকে ছাড়ে নি।

বলেছিল, সে রাতটা আর বীণা পাণিহাটিতে ফিরে যেতে পারবে না। তার ওখানেই খাবে এবং রাত্রে ঐখানেই থাকবে।

দু'বন্ধুতে বসে গল্প করছিল।

এমন সময় ভুলুর গান শুনে মণিকা তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে দেখল,

তার অনুমান ভুল নয়। সত্যি ভুলুই। রাস্তায় গান গাইছে।

একজন ভৃত্যকে ডেকে ভুলুকে রাস্তা থেকে ডেকে আনতে বললে মণিকা তখনি।

বীণার বুকের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে। গলা শুনে সেও চিনতে পেরেছিল ভুলুকে। একটু পরেই ভৃত্যের সঙ্গে লাঠি হাতে ভুলু এসে ঘরে প্রবেশ করল।

এসো ভুলু, বোসো।

ভালো আছেন দিদিমণি! ভুলু জবাবে বলে।

বীণা ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় অদূরে তার চোখের সামনে দণ্ডায়মান ভুলুর দিকে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ বোবা দৃষ্টিতে।

ভুলু তাহলে আজ সত্যি সত্যি একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে!

সোফার সামনে ধরে নিয়ে গিয়ে যত্নসহকারে মণিকা ভুলুকে বসিয়ে দেয়, বোসো।

কিন্তু আমার জামাকাপড় যে ময়লা দিদিমণি!

তা হোক।· এদিকে আর আস না কেন বলো তো?

ভুলু কোনো জবাব দেয় না, মৃদু একটু করুণ হাসি হাসে।

তারপর তোমার সেই বন্ধু লালুর খবর কি? কেমন পড়াশুনা হচ্ছে তার?

বোধ হয় ভালোই।

বোধ হয় ভালো কেন? তুমি জান না?

না। সে তো আমার সঙ্গে আর নেই দিদিমণি!

নেই! সে কি? কি হয়েছে তার?

কিছু হয় নি। সে অন্য জায়গায় চলে গেছে। সেখানে থেকেই সে পড়াশুনা করে।

বল কি? তোমাকে ছেড়ে সে চলে গেল?

হ্যাঁ। তার অসুবিধা হচ্ছিল কিনা। আমরা সব গরীব লোক, বস্তিতে থাকি। আমাদের সঙ্গে কি ওরা থাকতে পারে?

তাহলে তো একা একা তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে ভুলু!

না। কষ্ট আর কি? বাবা বলতেন, দিদিমণি, একা ভাবলেই একা, নইলে যার কেউ নেই তিনিই যে তার আছেন।

মুখটা তোমার শুকনো শুকনো লাগছে, খাও নি বুঝি এখনো কিছু?

এইবার বাড়িতে গিয়ে খাব।

তুমি বোসো ভুলু, আমি এখুনি আসছি।

না—না দিদিমণি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আমি এখুনি আসছি, তুমি বোসো। বীণা একটু বোস ভাই, আমি এখনি আসছি।

বীণা

চ·কে ওঠে ভুলু, বীণাও চমকে ওঠে। মণিকা কিন্তু ততক্ষণে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

॥ একুশ ॥

মণিকা স্বচ্ছন্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল বীণাকে বসিয়ে রেখে ভুলুর জন্য খাবার আনতে। আর বীণা সেই শীতের সন্ধ্যাতেও ঘামতে শুরু করেছে তখন।

বীণা জানে, ঐ যে মাথা নীচু করে মলিন-বেশধারী কিশোরটি বসে আছে সোফার ওপরে তার সামনে, সে অন্ধ। এ-জীবনের মতোই তার ঐ দুটি চোখের আলো নিবে গিয়েছে। ও আদৌ আর দেখতে পায় না, এই মুহূর্তে তাকেও দেখতে পাচ্ছে না। তবু—তবু চোখ তুলে বীণা ভুলুর দিকে তাকাতে পারে না। তার বড় আদরের ছোট ভাইটি! ভুলু! ভুলু!

ছেলেবেলায় বুকে করে কত আদর করেছে। কত গান শুনিয়েছে। সেই গান মুখে শুনে সঙ্গে সঙ্গে তার গেয়েছেও। সেই ভুলু।

আজ আব বীণার ওকে ডাকবার কোনো অধিকার নেই। সমস্ত অধিকার, সমস্ত দাবি নিজে হাতে সেদিন পথের মাঝখানে সে তো স্বেচ্ছায় ছিন্ন করে এসেছে!

কিন্তু স্নেহ?

ভাই ও বোনের যে চিবন্তন স্নেহ, সে যাবে কোথায়?

ভিতব থেকে একটা প্রচণ্ড তাগিদ যেন সজোবে সামনের দিকে বীণাকে কেবলই ঠেলতে থাকে—ওই উপবিষ্ট অন্ধ কিশোরটির দিকে। কে যেন ভিতব থেকে বলতে থাকে, ওরে তুই আজ বেঁচে থাকতেও তোর একটিমাত্র ভাই পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে!

মুখ তুলল বাণা। ভুলু মাথাটা নিচু করে বসে আছে নিঃশব্দে।

তার মনের ভিতরেও কি ঝড় বইছে না? কিন্তু না। না—ওরে ভিক্ষুক, ওবে লোভী, তুই যে পথের ভিক্ষুক, ও তোকে স্বাকার তো সেদিন করে নি, আজও করবে না, সাবধান!

নিজের অজ্ঞাতেই বীণা বোধ হয় স্নেহের অদৃশ্য টানে এক সময় উঠে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় এদিক ওদিক সভয়ে তাকাতে তাকাতে একেবারে ভুলুর পাশটিতে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে যায় ভুলুকে। হাওয়ায় বীণার শাড়ির আঁচলটা উড়ে ভুলুর গা ছুঁয়ে যায়। একটা মৃদু খসখসানি। ভুলু চমকে মুখ তুলে এদিকে তাকায় বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই।

চাপা কণ্ঠে ডাকে বীণা, ভুলু।

কে? চমকে মুখ তুলেই ভুলু মুখটা ফিরিয়ে নিল।

ভুলু, আমায় চিনতে পারছিস না, আমি—তোর দিদি বীণা!

না—আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না।

ভুলু, সত্যি চিনতে পারছিস না আমায়, আমি তোর দিদি বীণা!

না। আপনি বোধ হয় ভুল করছেন, আপনাকে তো আমি চিনি না, তা ছাড়া আমার কোনো দিদি নেই—

ভুলু!

না। না—আপনাকে তো আমি বললাম, আমার কেউ নেই, আপনাকে আমি চিনি না—না—বলতে বলতে এবারে উঠে দাঁড়ায় ভুলু এবং হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ঠিক এমনি সময় খাবারের থালা হাতে মণিকা এসে ঘরে ঢোকে। ভুলু ঘর থেকে চলে যাচ্ছে দেখে বলে ওঠে, এ কী! ভুলু, তুমি চলে যাচ্ছ! আমি যে তোমাকে বসতে বলে গেলাম। খাবার না খেয়েই চলে যাচ্ছ? হ্যাঁ রে বীণা, তুই ওকে বসতে বলতে পারিস নি!

ভুলু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। এমনিভাবেই থমকে দাঁড়িয়ে বলে, না দিদিমণি, ওঁর কোনো দোষ নেই, আমারই বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে চলে যাচ্ছিলাম!

মণিকা ভুলুর হাত ধরে এনে আবার বসিয়ে বলে, বোসো ভাই। খাও দেখি।

খাবে কি ভুলু! খাবার মুখে দিতে গিয়ে অন্ধ দুটি চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যায়। গলা আটকে আসে।

ভুলু ধরা গলায় বলে, পারছি না দিদিমণি। সত্যি আমার খিদে নেই, আমি খেতে পারছি না।

না। না—তাও কি হয়! খাও—

না, দিদিমণি আজ আমাকে ক্ষমা করুন। আর একদিন এসে খাব—বলতে, বলতেই ভুলু উঠে দাঁড়ায় এবং হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

মণিকা ব্যস্ত-সমস্তে বলে ওঠে, ভুলু শোনো! শোনো! দাঁড়াও—

না দিদিমণি, আজ আমাকে ক্ষমা করবেন। আর একদিন আসব। বলতে বলতে ভুলু এগিয়ে যায়।

বীণা পাথরের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে।

ভুলু ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। হতভম্ব মণিকা ব্যাপারটা যেন ঠিক বুঝতে না পেরে তার পিছনে পিছনে

যেতে যেতে ডাকে, ভুলু ! শোনো ! শোনো !

সিঁড়ি দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে নামতে নামতে ভুলু বলে, না ! না !

ভুলু নেমে যায় ।

॥ বাইশ ॥

এদিকে অনেক পরে ঘরের মধ্যে ফিরে এসেই মণিকা থমকে দাঁড়ায়, সোফার উপরে উবুড় হয়ে মুখ গুঁজে বীণা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ।

মণিকা অবাক হয়ে যায়। ব্যাপারটা কিছুই যেন ও বুঝতে পারে না।

বীণা ! বীণা ! কী—কী হয়েছে ভাই ! তুই কাঁদছিস কেন ?

বীণা জবাব দেয় না । ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকে ।

অনেক বলবার পর একসময় মাথা তুলে অশ্রুঝরা চোখে ধরা গলায় বলে, ও—ও আমাকে স্বীকার করল না ভাই !

কে স্বীকার করল না তোকে ? কি বলছিস তুই ?

আমি ভীতু, আমি পাপী ।

বীণা !

হ্যাঁ ভাই । তোকে আমি লজ্জায় বলতে পারি নি, ভুলু, ঐ

কি—কি—

আমার—ও আমার আপন মায়ের পেটের ছোট ভাই ।

বীণা ! আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে মণিকা ।

হ্যাঁ । কিন্তু সেদিন রাস্তায় ওকে চিনেও চিনতে পারি নি বলে—আজ ও আমাকে কিছুতেই স্বীকার করল না । আমি যাই—বলতে বলতে বীণা উঠে দাঁড়ায় ।

কোথায়—কোথায় যাবি ?

ভুলুকে ফিরিয়ে আনতে—

বীণা একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। মণিকাও তাকে অনুসরণ করে, বীণা, দাঁড়া। শোন্! শোন্—

কিন্তু কোথায় ভুলু তখন ?

শূন্য রাস্তা খাঁ খাঁ করছে !

বীণা ডাকে, ভুলু! ভুলু!

ব্যর্থ প্রতিধ্বনি ফিরে আসে কেবল।

অন্য একটা অন্ধকার গলিপথে ভুলু তখন হাতড়ে হাতড়ে চলেছে। কানে ভেসে আসছে বীণার ডাক, ভুলু! ভুলু!

বীণা কাঁদতে থাকে, কী হবে ভাই! ভুলু—

কাঁদিস না বীণা। তুই বাসায় ফিরে চল। সে আবার আমার কাছে আসবে—

না। না—তুই তাকে জানিস না মণি। সে বড় অভিমানী! সে বড় অভিমানী! আর সে এ-মুখোও হবে না।

আসবে। আসবে—আমি বলছি সে আবার আসবে। আর এবারে এলে তাকে আমরা যেতে দেব না। চল। বাড়িতে চল।

ভুলু আবার টাকা জমাতে শুরু করে। কিন্তু কেন, কার জন্য যে টাকা জমাচ্ছে তা সে নিজেই জানে না। একদিন তারই সমবয়সী একটি বস্তির ছেলে ফটকেকে ডেকে বলে ভুলু, ফটিক, শোন ভাই!

কেন রে ?

আমার—আমার একটা কাজ করে দিবি ভাই ? তোকে একটা টাকা দেব।

টাকার কথায় ফটিক উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, কী বল ?

লালুর স্কুলের ঠিকানাটা ও কুলদাবাবুর বাসার ঠিকানাটা দিয়ে বলে, লালুর খোঁজটা আমাকে এনে দিবি ভাই। সে কেমন আছে। পড়াশুনা তার কেমন হচ্ছে। কিন্তু খবরদার, আমার কথা যেন

না জানতে পারে। জানতে যেন না পারে যে, আমার কাছ থেকে তুই গেছিস।

কেন জানতে পারবে? ঠিক তোকে খবর এনে দেব দেখিস। দে—টাকাটা দে।

ভুলু তার সঞ্চিত অর্থ থেকে একটি টাকা তুলে দেয় ফটিকের হাতে। ফটিক চলে যায়।

পরের দিন ফটিক এসে জানায়, লালু দিব্বি আছে।

তোকে চিনতে পারলে?

হ্যাঁ। কেন পারবে না? বেশ চিনল।

হ্যাঁরে, আমার কথা সে কিছু জিজ্ঞাসা করল না তোকে?

হুঁ। আমার সঙ্গে কথাই বলে না তো, তোর কথা। সে কি আজকাল আর ভিক্ষুক আছে রে, সে এখন বাবু বনে গেছে। স্কুলের বাবু। সামনে তার পরীক্ষা, পরীক্ষা দেবে।

ফটিকের সাহায্যেই ভুলু লালুর খবর নিতে লাগল।

কিন্তু লালুর ভাগ্যেও কুলদাবাবুর আশ্রয়-সুখ বেশীদিন টিকল না।

ঠিক পরীক্ষার এক মাস আগে তার আশ্রয়দাতা হেডমাস্টার কুলদাবাবু রক্ত-চাপাধিক্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যা নিলেন।

যাঁর স্নেহের ওপরে নির্ভর করে লালু ভুলুর মতো বন্ধুকেও অনায়াসে ত্যাগ করে এখানে এসে উঠেছিল, আজ তিনিই যখন শয্যাশায়ী হলেন, লালু চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগল।

মুখ বুজে লালু কুলদাবাবুর সেবা করে।

কুলদাবাবু বলেন, সব সময়েই আমার বিছানার কাছে বসে থাকিস বাবা, তোর যে পরীক্ষা ঘরের দরজায়—যা পড় গে। কিছুই যে তোর পড়াশুনা হচ্ছে না।

তা হোক স্যার। লালু জবাব দেয়।

না বাবা। পড়—তোর উপরে যে আমার অনেক আশা।

লালুর অক্লান্ত সেবায় আজ কুলদাবাবুর স্ত্রী সুধা দেবীরও চোখ

খুলে যায় বোধ হয়। চরম দুঃখ ও বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে আজ যেন তিনি লালুর মধ্যেই পরম এক আত্মীয়কে নতুন করে খুঁজে পান।

কিন্তু গরীব স্কুলমাস্টার কুলদাবাবু। দেখতে দেখতে সঞ্চয় তাঁব ফুরিয়ে আসে।

ওষুধের পয়সা নেই। ওষুধ আনতে হবে। লালুর ফিসের জন্য কুলদাবাবু কিছু টাকা আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন, সুধা দেবী যখন সেই টাকা চাইলেন, কুলদাবাবু প্রবলভাবে আপত্তি জানালেন, না। না—ও টাকা ওর ফিসের। ও টাকা তুমি খরচ করতে পারবে না সুধা। ওষুধে আমার প্রয়োজন নেই। ওষুধ খেয়েই বা কী হবে। এ রোগ ভালো হবার নয়।

কুণ্ঠিত লালু বলে, স্যার আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, নাইবা হল আমার এ বছরে পরীক্ষা দেওয়া, সামনের বছরে আমি পরীক্ষা দেব!

না। তা হয় না লালু, এবারেই তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। আমি তোমার পরীক্ষার ফলাফল যে দেখে যেতে চাই।

কিন্তু লালু কিছুতেই সম্মত হয় না কুলদাবাবুর কথায়। জোব করে টাকা নিয়ে গিয়ে ওষুধ কিনে আনে।

কুলদাবাবু কেঁদে ফেললেন, এ তুই কি করলি লালু! এখন ফিসের টাকা তুই কোথায় পাবি?

লালু বলে, আপনি ভালো হয়ে উঠুন স্যার, তারপর পরীক্ষা দেব।

স্কুলে গিয়ে লালু গোপনে অ্যাকাউনটেন্ট বাবুকে জানিয়ে আসে এ বছরে সে পরীক্ষা দেবে না।

ঐ কথাটা জানাতে লালুর কম দুঃখ হয় না। বুকটা যেন তার ভেঙে যায়। কিন্তু উপায়ই বা কী? ফিসের টাকা না দিলে তো আর পরীক্ষা দেওয়া যাবে না।

কুলদাবাবু একদিন লালুকে ডেকে একটা চিঠি দিয়ে টাকার

জন্য এক ভদ্রলোকের নিকট পাঠালেন। কিন্তু সেখান থেকেও লালু হতাশ হয়ে ফিরে এল। এদিকে কুলদাবাবুর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে লাগল। চিকিৎসা তো দূরের কথা, পথ্যই জোটে না বুঝি।

কুলদাবাবুর শিয়রের কাছে সুধা দেবী বসে থাকেন। আর পায়ের কাছে বসে থাকে নিরুপায় লালু। মাঝে মাঝে লালুর মনে হয় ভুলুর কথা, কিন্তু কোন্ লজ্জায় তার কাছে গিয়ে সে আবার দাঁড়াবে!

॥ তেইশ ॥

পুত্রহীন কুলদাবাবু লালুকেই পুত্রের মতোই বুঝি ভালবেসেছিলেন। এবং ভাগ্যহীন লালুও অল্পবয়সে মা-বাপকে হারিয়ে যে দুঃখ পেয়েছিল, কুলদাবাবুর স্নেহে সেই দুঃখকে ভুলে নতুন করে আবার যেন হারানো পিতৃস্নেহকে খুঁজে পেয়েছিল। এবং সন্তানহীনা বন্ধ্যা নারী কুলদাবাবুর স্ত্রী, সুধা দেবীও এমনিতে দৃঢ় ও কর্কশ প্রকৃতির নারী হলেও আসলে মনটা তাঁর খুব খারাপ ছিল না। এবং কুলদাবাবু অসুস্থ হবার পর থেকে লালুর অকৃত্রিম প্রাণঢালা সেবা ও যত্ন এবং তিনি খারাপ ব্যবহার করা সত্ত্বেও লালুর নির্বিকার সহনশীলতা দিনের পর দিন তাঁকে বিচলিত না করে পারে নি, ফলে প্রথমটায় লালুকে সহ্য করতে না পারলেও পরে তাকে পুত্রস্নেহে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

কুলদাবাবুর ছোট্ট আনন্দময় সংসারটির মধ্যে দারিদ্র্য ও নিরানন্দের কালো ছায়া নেমে এল। হতভাগ্য লালু ছটফট করতে লাগল। যেমন করেই হোক কুলদাবাবুদের সংসারে একটা স্বাচ্ছন্দ্য আনবার জন্য ছটফট করতে লাগল। ভুলে গেল তার পড়াশুনা,

মানুষ হবার কথা। তাই ভাবতে ভাবতে সেদিন বহুদিন পরে লালু তার সাধের প্রিয় মাউথ অর্গানটি বের করল।

ঠিক। ঠিক। আবার সে পথে পথে মাউথ অর্গান বাজিয়ে উপার্জন করে পয়সা আনবে। মানুষের দ্বারে এমনি এমনি তো আর সে হাত পাতবে না। মাউথ অর্গান বাজিয়ে আবার সে রোজগারই করবে।

কিন্তু চেনা রাস্তা নয়। চেনা মহল্লে নয়। যেতে হবে অন্যত্র, কোনো দূর অঞ্চলে, অন্যত্র কোনো নয়া রাস্তার ধারে। প্রথমত, যেখানে কেউ তাকে চিনতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, ভুলুর পরিচিত রাস্তাঘাটও নয়। সে যে আবার উপার্জনে নেমেছে অন্তত ভুলু যেন না জানতে পারে। ভুলু জানতে পারলে যে তার লজ্জার অবধি থাকবে না।

লালু ঠিক করে ফেলল, ঐদিনই সন্ধ্যার পর সে উপার্জনে বের হবে আবার।

হাঁটতে হাঁটতে লালু ধর্মতলা অঞ্চলে চলে এল।

কিন্তু এক বৎসর আগে যে ব্যাপারটা তার কাছে যতখানি সহজ ছিল, আজ কিন্তু সেটা ততখানি সহজ মনে হল না।

ধীরে ধীরে একটা প্রকাণ্ড দোকানের উজ্জ্বল শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়াল লালু। পকেট থেকে মাউথ অর্গানটি বের করল।

কিন্তু যতবার সে মাউথ অর্গানটা মুখে তুলে নিয়ে তাতে সুর তোলবার চেষ্টা করে, ততবারই যেন কী এক অদৃশ্য শক্তি তার উদ্যত উত্তোলিত হাত দুটোকে শিথিল করে দেয়।

লালুর কেবলই মনে হয় সবাই যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

এদের চোখের সামনে মাউথ অর্গানটি তুলে বাজাতে শুরু করলেই সকলে বলবে, ভিক্ষা করছে, মাউথ অর্গান বাজিয়ে ভিক্ষা করছে।

মাত্র একটি বৎসর কুলদাবাবুর আশ্রয়ে থেকে লালুর এমনি

পরিবর্তন হয়েছিল যে,—সেদিন যার মধ্যে সে দেখেছিল উপার্জনের গৌরব আজ তার মধ্যেই সে যেন দেখতে পাচ্ছে ভিক্ষার দৈন্য। দারিদ্র্যের নির্লজ্জতা।

তখুনি আবার মনে পড়ে, গৃহে চিকিৎসার অভাবে অসুস্থ শয্যা-শায়ী কুলদাবাবুর কৃশ মুখখানা। সুধা দেবীর অসহায় করুণ দৃষ্টি।

সকাল বেলাতেও সুধা দেবী তাকে বলছিলেন, কি হবে লালু? একটা পয়সাও যে আর হাতে নেই। শেষ সম্বল বালাটা বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল তারও একটি পয়সা অবশিষ্ট নেই।

না। না—যেমন করে হোক তাকে উপার্জন করতেই হবে।

মনের সমস্ত দুর্বলতা, সমস্ত দ্বিধাকে সরিয়ে ফেলে লালু তুলে নিল মাউথ অর্গানটি ওষ্ঠের উপর। ফুঁ দিল তাতে।

কিন্তু কোথায় সেই মিষ্টি বাজনার সুর! পীড়িতের আর্তনাদের মতো শুধু একটা বিশ্রী গর্জন করে উঠল মাউথ অর্গানটা।

পারল না। পারল না লালু সুর জাগাতে আজ আর তার সেই পরিচিত অভ্যস্ত মাউথ অর্গানটিতে।

সে পরিচিত সুর সে হারিয়ে ফেলেছে অনেক দিন আগেই। ওষ্ঠ তার ভুলে গেছে বড় চেনা সুরের পর্দাগুলো।

চেষ্টা করল লালু, অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু মাউথ অর্গান থেকে তার সুর বের হল না আজ আর।

ভুলুর কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিলিয়ে সেই যে গানটা কতদিন বাজিয়েছে সে, তোমার বিশ্বে সকলই পূর্ণ, রিক্ত শুধু কি রব মোরাই! কিছুতে সে গানটাও তার মনে এল না।

দু চোখ ভরে ফোঁটায় ফোঁটায় জল নেমে এল শুধু লালুর।

আর ঠিক সেই সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সামনে রেলিংয়ের ধারে বসে ভুলু ঐ গানটিই গাইছিল,—তোমার বিশ্বে সকলই পূর্ণ, রিক্ত শুধু কি রব মোরাই! চলমান পথিকের দল একটি দুটি করে পয়সা দিয়ে যাচ্ছে।

বাড়িতে ফিরে এল লালু,—ক্লান্ত অবসন্ন।

রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা। একাকিনী সুধা দেবী লালুর প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায় বার বার খোলা জানালা-পথে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছেন।

দরজা খোলা দেখে চোরের মতো মাথা নিচু করে লালু এসে ঘরে ঢুকল।

এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি রে লালু?

লালু কোন কথা বলতে পারল না। জলে-ভরা ঝাপসা চোখ তুলে তাকাল কেবল সুধা দেবীর মুখের দিকে।

ঘরের আলোয় লালুর চোখে জল দেখে সুধা দেবী এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, কি হয়েছে লালু?

আর ওদিকে বস্তিতে তখন সেই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে ভূতগ্রস্তের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ভুলু।

একটু আগে ফটকে এসে জানিয়ে গেছে, সে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনে এসেছে, কুলদাবাবুর নাকি খুব অসুখ। লালু এবারে পরীক্ষা দেবে না। ফিস জমা দিতে পারে নি। ভুলু ভাবছিল, তবু লালু একটিবার তার কাছে এল না! আজ সে লালুর কাছে এত পর হয়ে গেছে! চোখের কোল দুটো তার জলে ভরে আসে।

ভুতোর মা ঐ সময় খাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকে ভুলুকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে ভুলু?

কিন্তু ভুলু কোনো জবাব দেয় না।

॥ চব্বিশ ॥

ভুতোর মা আবার জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে ভুলু।

ভুলু এবারেও কোনো জবাব দেয় না; কিন্তু হঠাৎ ভুতোর মার

নজরে পড়ে, ভুলুর ছুই অন্ধ চোখের কোল বেয়ে ক্ষীণ প্রবহমান ছুটি অশ্রুধারা।

কাছে এবারে এগিয়ে এল ভূতোর মা, ভুলুর পিঠের ওপরে একখানি হাত রেখে স্নেহকরুণ কণ্ঠে শুধাল, কি হয়েছে ভুলু! কাঁদছিস কেন!

নিজের অজ্ঞাতেই ভুলুর চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছিল, হঠাৎ যেন সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভারি লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি বাঁ হাত দিয়ে চোখের কোল ছুটো মুছে নিয়ে বলে, কে, মাসী! কখন এলে মাসী, টের পাই নি তো!

কিন্তু তোর হয়েছে কি বল তো?

কই কিছু হয় নি তো!

কিছু হয় নি তো চোখ দিয়ে তোর জল পড়ছিল কেন?

মাঝে মাঝে অমনি চোখ দিয়ে আজকাল আমর জল পড়ে মাসী।

তা হ্যাঁরে, চোখের জন্য হাসপাতাল থেকে যে কি সব ওষুধ এনে খাচ্ছিলি তাও তো আজকাল আর খাস না দেখি!

কি হবে আর ওষুধ খেয়ে মাসী, মিথ্যে মিথ্যে। চোখের যে স্নায়ু দিয়ে মানুষ দেখতে পায় ডাক্তার বলেছে তাই যে আমার একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।

তা হোক, চল, আরো না হয় কোনো একজন বড় চোখের ডাক্তারের খোঁজ করে তোর চোখটা দেখাবি।

ভুলু হাসে। বড় করুণ সে হাসি। বলে, তা হবে'খন। এখন কিছু খেতে দাও তো।

খাবার নিয়েই তো এসেছিলাম। নে, বোস খেতে।

মাসী খাবারের থালা সামনে ধরে দিয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেয়।

ভূতোর মা ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল, ভুলু বলে, ফটকেকে একটু আমার কাছে ডেকে দেবে মাসী?

দিচ্ছি, বলে ভূতোর মা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আহারে ভুলুর রুচি ছিল না। ইচ্ছাও করছিল না। ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসেই থাকে ভুলু।

একসময় ফট্‌কে এসে ঘরে ঢোকে, আমায় ডাকছিলি ভুলু?

কে, ফট্‌কে? আয়।

কি বল?

কাল দুপুরে একবার লালুদের স্কুলে আমাকে নিয়ে যেতে পারিস ফট্‌কে?

কেন পারব না! কিন্তু কি হবে সেখানে গিয়ে? লালু তো শুনলাম আর স্কুলেই আসে না।

তা হোক। কাল দুপুরে আমরা যাব, বুঝলি?

আচ্ছা।

পরের দিন ফট্‌কেকে সঙ্গে করে ভুলু লালুদের স্কুলে গিয়ে হাজির হল। এবং খোঁজ নিয়ে একেবারে স্কুলের অ্যাকাউনটেণ্ট বাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

অ্যাকাউনটেণ্ট রমেনবাবু মুখ তুলে তাকালেন, কি চাও?

আপনাদের স্কুল থেকে এবারে ললিতমোহন বলে একটি ছেলের পরীক্ষা দেবার কথা ছিল না? ভুলু প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। ছেলেটা লেখায়-পড়ায় খুব ভালো ছিল। পরীক্ষা দিলে হয়তো বৃত্তি পেত, কিন্তু ফিসের টাকাই যোগাড় করতে পারলে না।

এখনো দিলে হয়?

কেন হবে না? লাস্ট ডেট তো এখনও পার হয় নি?

কত ফিস?

পঁচিশ টাকা।

ভুলু কোমর থেকে কয়েকটা নোট বের করে।

দেখুন, আমি যদি তার পরীক্ষার ফিসটা জমা দিয়ে যাই। ভুলু প্রশ্ন করে।

তুমি দেবে?

হ্যাঁ।

কিন্তু—

পরীক্ষার ফিস জমা দিলেই তো হল। তা সে যেই দিক না।

তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি কে? তার কেউ হও বুঝি?

লালু যে একদিন বস্তি থেকে এসে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল রমেনবাবু তা জানতেন। তাই ভুলুকে ঐ বস্তিরই কেউ হবে ভেবে প্রশ্নটা করলেন।

আমি তার কেউ নই।

তবে?

নাই বা হলাম আমি তার কেউ, আপনার জন! কেউ না হয়ে বুঝি ফিস দেওয়া যায় না? এই নিন টাকা। গুনে দেখুন।

রমেনবাবু একটু আশ্চর্য হয়েই যেন হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিলেন। দুটো টাকা বেশী ছিল, সে দুটো গুনে ফেরত দিতে দিতে বললেন. সত্যি করে বল তো কে তুমি তার?

বললাম তো আপনাকে, আমি তার কেউ নই। সে টাকার অভাবে ফিস দিতে না পারায় পরীক্ষা দিতে পারছে না শুনেই আমি দিলাম তার ফিসটা। এক জায়গাতেই একদিন আমরা ছিলাম।

কিন্তু তোমার নামটা কি?

আমার নাম?

হ্যাঁ।

তাও আপনি নাই বা শুনলেন। আপনি শুধু ফিসটা জমা করে নিন তার নামে আর সে যেন পরীক্ষাটা দিতে পারে তাই দেখবেন।

কিন্তু সে যখন জিজ্ঞাসা করবে কে তার ফিস দিয়ে গেল। কি তাকে বলব? সে যা আত্মাভিমানী ছেলে—

না, না—দয়া করে তাকে কিছু বলবেন না। ঘুণাক্ষরেও যদি সে জানতে পারে যে আমি ফিস দিয়ে গেছি. সে পরীক্ষাই হয়তো দেবে না। সত্যিই সে বড় অভিমানী। শুধু তাই নয়, ভিখারীদের সে

ভয়ানক ঘৃণা করে বাবু।

অবাক বিস্ময়ে রমেনবাবু অন্ধ ছেলেটির কথা শোনেন। মলিন জীর্ণ বেশ, একটি অন্ধ ছেলে, খুব সম্ভবত কোনো নিম্নশ্রেণীর ছেলে, কিন্তু তার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যান। এবং কৌতূহলও বোধ করেন।

বেশ তা নয় হল, কিন্তু আমার কাছে তোমার সত্যিকারের নাম ঠিকানা না বললে তো এ টাকা আমি জমা করে নিতে পারি না। রমেনবাবু বললেন।

ভুলু অতঃপর কি যেন ভাবে, তারপর বলে, বেশ, নাম বলছি ; কিন্তু বলুন, তার কাছে কখনো আপনি আমার নাম প্রকাশ করবেন না?

কেন বলো তো!

বললাম তো আপনাকে, তাহলে, সে আমি জানি, কিছুতেই পরীক্ষা দেবে না!

বেশ, এখন বলব না। তবে পরীক্ষার পরে বলে দেব কিন্তু।

কি ভেবে এবারে ভুলু বলে, তা—তা নয় পরে বলবেন।

রমেনবাবু তখন লালুর ফিস জমা করে নিলেন।

কিন্তু বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে রমেনবাবু লালুকে কোনো সংবাদই দিতে পারলেন না।

সাত দিন পরে যখন লালুর খোঁজে কুলদাবাবুর ওখানে গেলেন, সেখানে গিয়ে শুনলেন, দিনচারেক হল কুলদাবাবুর মৃত্যু হওয়ায় লালুকে নিয়ে কুলদাবাবুর স্ত্রী সুধা দেবী শ্যামনগরে তাঁর ভাইয়ের ওখানে চলে গিয়েছেন। তাঁদের ঠিকানাটি অবশ্যি পাওয়া গেল পাশের বাড়িতেই।

॥ পঁচিশ ॥

সেদিন মধ্যরাত্রে সুধা দেবীর ডাকে লালুর ঘুমটা ভেঙে গেল, লালু। লালু—

ক্ষুধা-ক্লান্ত লালু ঘুমিয়ে পড়েছিল, চোখ রগড়াতে রগড়াতে তাড়াতাড়ি উঠে বসল, কি হয়েছে মা?

উনি ডাকছেন—একবার আয়।

কুলদাবাবুর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছিল, লালু পাশে এসে দাঁড়াল।

ললিত। এসো—অতি কষ্টে টেনে টেনে ডাকলেন কুলদাবাবু। লালু পাশে এসে বসল।

আমার সময় আর নেই বুঝতে পারছি বাবা। অনেক আশা করে তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম ললিত কিন্তু কিছুই আমি তোমার করতে পারলাম না বাবা। চিরদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধই কবে গেলাম, কিন্তু পারলাম না তাকে জয় করতে।

স্যার আপনার কষ্ট হচ্ছে, এখন ওসব কথা থাক্।

না ললিত, বলব বলেই তোমাকে আমি ডেকেছি, বলতে দাও। এ জীবনে দারিদ্র্য ও বিরূপ ভাগ্যকে আমি জয় করতে পারলাম না বটে, কিন্তু আমার অসমাপ্ত চেষ্টা তোমার মধ্যে আমি রেখে গেলাম। একজন মানুষের একটা জীবনের ভিতর দিয়েই তার কাজ শেষ হয় না—এই আমার চিরদিনের বিশ্বাস। তাই আমি যা পারলাম না, অসম্পূর্ণ রেখে গেলাম, তাকে তুমি সম্পূর্ণ কোরো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি স্যার আমি নিশ্চয়ই আপনার কথা চিরদিন স্মরণে রেখে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করব।

আমি তা জানি ললিত। মনে রেখো, মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। একটা জন্ম বা সেই জন্মের যা কিছুর ভিতর দিয়েই কোনো একটি মানুষের ইতিহাস শেষ হয়ে যায় না। জন্ম থেকে জন্মান্তরে,

কর্ম থেকে কর্মান্তরে, চেষ্টা থেকে চেষ্টান্তরে মানুষ তার ইতিহাস রচনা করে চলেছে। আর সেই চেষ্টার ইতিহাসই মানুষের বাঁচবার ইতিহাস। তেমনি করে তুমি যেন বাঁচতে পারো ললিত।

আশীর্বাদ করুন স্যার, যেন তাই পারি।

পারবে ললিত। আমি জানি তুমি পারবে। দুঃখের ভিতর দিয়ে যাকে তুমি চিনেছ—সেই তোমাকে পথ দেখাবে।

আর কথা বলতে পারলেন না কুলদাবাবু। গলা তাঁর ভেঙে এল। শেষ কথা শুধু তিনি বললেন, সুধা দেবীকে সে যেন দেখে।

কুলদাবাবুর মৃত্যুর পব দুটো দিনও আর সুধা দেবী কলকাতায় থাকতে পারলেন না। একেবাবে শেষ সম্বল হাতের সোনাটুকু খুলে যা ধারকর্জ ছিল কোনমতে শোধ দিয়ে তার ভাইয়ের বাসায় চলে গেলেন শ্যামনগর।

লালুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

আজ তাঁর পক্ষে আর লালুকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। কারণ স্নেহ আর দরদ দিয়ে লালু সুধা দেবীর মনটা সম্পূর্ণ জয় করে নিয়েছিল। সুধা দেবীর ভাই যতীনবাবু, তাঁরও অবস্থা সচ্ছল ছিল না। ছোটখাটো একটা স্টেশনারী দোকান, তারই আয়ে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনমতে কায়ক্লেশে দিন কাটান। তাই শ্যামনগরে পা দিয়েই লালু বুঝেছিল যে যতীনবাবুর সংসারে বোঝা হয়েই দাঁড়াবে যদি না সেই সংসারে সে কিছু সাহায্য করতে পারে।

যতীনবাবুর বোন, তাঁকে না হয় যতীনবাবু দেখতে পারেন, কিন্তু সে কে যতীনবাবুর? কোন্ সম্পর্কে যতীনবাবু তার ভার টানবেন আর সেই বা কোন্ দাবীতে সে আশা করতে পারে? যেমন করে হোক একটা উপায় বের করতেই হবে! কিন্তু লালু ভেবে পায় না সে কি করবে। এমনি করে বসে থাকলে তো চলবে না। লালু অনেক ভেবে ঠিক করল স্টেশনে সে চানাচুর বিক্রি করবে। পরীক্ষা তাকে সামনের বছর না হোক পরের বছর দিতেই হবে। পাস তাকে

করতেই হবে। নিজের পায়ে নিজে তাকে দাঁড়াতেই হবে। নিষ্ক্রিয় সে বসে থাকতে পারবে না অন্যের গলগ্রহ হয়ে। তাই সে উপার্জন শুরু করে দিল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে চানাচুর বিক্রি করে, রাত্রে বই নিয়ে পড়াশুনো করে।

হতাশায় এক-একসময় বুক যেন তার ভেঙে যায়, আবার সুধা দেবীর উৎসাহে সাহসে বুক বাঁধে।

কিন্তু সুধা দেবী ব্যাপারটা জানতে পেরে একদিন লালুকে ঘরে ডেকে এনে বললেন, হ্যাঁ লালু, তুই নাকি স্টেশনে চানাচুর বিক্রি করছিস আজকাল?

হ্যাঁ মা। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় লালু।

শেষ পর্যন্ত চানাচুর বিক্রি করতে আরম্ভ করলি!

কেন মা, কি এমন হয়েছে তাতে?

না লালু, না—ওসব তুই ছেড়ে দে।

তুমি তো জান না মা, একসময় রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে পেট চালিয়েছি আমরা। স্যার বলতেন, স্বাধীনভাবে রোজগারের মধ্যে কোনো অপমান নেই; হাত পেতে ভিক্ষা করার চাইতে সে সহস্র গুণে গৌরবের। তুমি দুঃখ কোরো না মা। আজ আমি চানাচুর বিক্রি করলেও স্যারের কথা আমি ভুলি নি। মানুষ আমি হবই। মানুষ আমাকে হতে হবেই।

কি জানি কেন, সুধা দেবী আর কোন কথা বলতে পারলেন না।

এমনি সময় সকালবেলা একটা চিঠি এল লালুর নামে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার মশাই তার পরীক্ষার 'অ্যাডমিট কার্ড' পাঠিয়েছেন এবং লিখেছেন পরীক্ষা সে দিতে পারবে।

আনন্দে বিস্ময়ে লালু যেন হকচকিয়ে যায়। ছুটে যায় চিঠিটা হাতে সুধা দেবীর কাছে।

মা, মা, দেখো, আমার পরীক্ষার 'অ্যাডমিট কার্ড' এসেছে!

কলকাতা ছাড়বার কিছুদিন আগে কুলদাবাবুর পরামর্শমতোই লালু স্কুল কমিটির কাছে একটি দরখাস্ত করেছিল, অনুগ্রহ করে তাঁরা যদি তার পরীক্ষা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। কারণ তার অর্থ নেই পরীক্ষার ফিস দেবার মতো। লালু 'অ্যাডমিট কার্ড'টা পেয়ে ভাবে বোধ হয় স্কুল কমিটিই তাকে সাহায্য করেছেন। অন্য কোনো কথা তার মনেই হয় না। স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে না যে এর মধ্যে তার সেই বন্ধু ভুলুর কোনো হাত আছে বা থাকতে পারে।

দ্বিগুণ উৎসাহে আবার লালু পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। হাতে আর মাত্র ২৫টি দিন আছে। দিবারাত্র লালু বই নিয়েই পড়ে থাকে এবং যথাসময়ে লালু কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসে। ভালোই সে পরীক্ষা দেয়।

এদিকে পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসে দেখে যতীনবাবু স্থানীয় একটা বড় মুদিখানায় মাসিক পনেরো টাকা হিসাবে লালুর জন্য একটা খাতা লেখার কাজ ঠিক করে ফেলেছেন।

পরীক্ষার ফল বেরুতে দু-তিন মাস দেরি—অতএব এ দু-তিন মাস না বসে থেকে সুধা দেবীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও লালু সেই কাজেই লেগে যায়।

এদিকে ভুলু ফটিকের মুখেই শুনেছে, লালু কলকাতায় এসে পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু শরীর তার ক্রমেই যে কেমন নিস্তেজ হয়ে আসছে। কেমন দুর্বল, কেমন অবসন্ন। দীর্ঘদিনের অনিয়ম, অপুষ্টিকর খাদ্য, মানসিক দুশ্চিন্তা তার দেহের কোষগুলিকে যেন শুষে নিয়েছিল। বেশির ভাগ দিনই আজকাল আর ভুলু গাইতে বের হতে পারে না, মাথাটার মধ্যে ঝিমঝিম করে, পা দুটো কাঁপে। কিন্তু না বেরুলেও উপায় নেই। খাদ্য জুটবে কোথা থেকে।

পথের ধারে বসে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ একসময় আপন মনেই থেমে যায়। কত কথা মনে পড়ে। বেশী করে মনে পড়ে লালুর কথাই। আর একজনের কথাও মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে—দিদি বীণার

কথা। এখনও যেন কানে তার বাজে সেই কাঁপা আর্ত করুণ কণ্ঠস্বর,—ভুলু আমায় তুই চিনতে পারছিস না! আমি তোর দিদি, বীণা!

না—না—কেউ তার নেই! কেউ তার নেই! সে একা, এ সংসারে সে একা। পাছে দিদির নজরে পড়ে এই কারণে আজকাল ভুলু কলেজ স্ট্রীটের সেই চিরপরিচিত ফুটপাথের ধারে বসে আর গান গায় না, আমহার্স্ট স্ট্রীটের বড় পার্কটার ধারে বসে গান গায়।

অনেক আশা করেছিল সে। তার ব্যর্থ অন্ধ জীবন লালুর মধ্যে দিয়ে সে সফল ও পূর্ণ করে তুলবে। দুঃখকে সে গ্রাহ্য করে নি। শত বিপর্যয়েও সে ভেঙে পড়ে নি। কিন্তু কি হল!

সব ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল!

চোখে দেখার দরজাটা তো বন্ধ হয়ে গিয়েছেই, মনের অনুভূতির দরজাটাও হয়তো একদিন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর?

অন্ধ ভুলু হয়তো হারিয়ে যাবে চিরদিনের মতো। ক্ষণিকের একটা বুদ্বুদ পৃথিবীর এই সীমাহীন সমুদ্রে মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু কেন? কেন সে এমনি করে হারিয়ে যাবে? কেন? কেন?

॥ ছাব্বিশ ॥

আজ পর্যন্ত ভুলু কখনও কাঁদে নি। বিশেষ করে চরম দুঃখ ও বিপর্যয়ের আঘাতেও ভুলু একফোঁটা চোখের জল ফেলে নি কোনো দিন।

ছোট বেলায় তার বাবাকে দেখেছে, সংসারের নিত্য অভাব, অনটন, দুঃখ ও বিপর্যয়ের মধ্যে কখনও তাঁর মুখের হাসিটি মুছে যায় নি।

তিনি বলতেন, ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়েও যে হাসিমুখে এগিয়ে

যেতে পারে সেই তো সত্যকার মানুষ। সোনার বাটিতে রুপোর চামচেয় সকলের মুখে দুধ জোটে না। কিন্তু সে তো সংসারে শতকরা একটার বেশী নয়, তা বলে কি আর বাকী যে নিরানব্বুই জন তারা হারিয়ে যাবে! না হারিয়ে গিয়েছে যুগে যুগে মানুষের বাঁচবার মন্ত্র!

তবে কেন আজ ভুলুর বার বার মনে হয় সে ফুরিয়ে গেল? সে হারিয়ে যাচ্ছে?

ঐ সঙ্গে মনে হয়, এর চাইতে যদি মণিকা দিদিমণির কথামত সে কোনো অন্ধ-বধির স্কুলে ভর্তি হত! চেষ্টা করত নতুন করে বাঁচবার!

সেদিন চেষ্টা করলে হয়তো পারত। কিন্তু আজ আর তার সে শক্তিই বা কোথায়?

সেদিন তার সামনে ছিল লালু। লালুর সাধনা ও চরিতার্থতার মধ্যে দিয়েই সেদিন সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ সে বুঝতে পারছে, তার সেদিনকার সে ত্যাগের যা কিছু গৌরব একমাত্র তারই ছিল। লালু তাকে স্বীকৃতির মর্যাদা দিতে পারলে না বলে সব কিছুই আজ বুঝি মিথ্যে হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আবার কি সত্যই সে নতুন করে বাঁচতে পারে না চেষ্টা করলে? তা ছাড়া লালু যে কারণে তাকে ত্যাগ করে গেল তা কি সত্যি?

সত্যিই কি মানুষের পারিপার্শ্বিক জীবন ক্ষেত্রবিশেষে তার বাঁচবার বা সাফল্য লাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়? সত্যিই কি এই বস্তী-জীবনের অশিক্ষা, অনিয়ম, রুচি-বিকৃতি, অপরিপুষ্ট আহার, অপরিচ্ছন্ন বাসস্থান, মানুষের সত্যিকারের মানুষ হয়ে বাঁচবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে? না; নিজের ইচ্ছা ও সাধনা থাকলে এর মধ্যেও মানুষ তার পথ খুঁজে নিতে পারে? কোন্‌টা সত্যি কে তাকে বলে দেবে?

নানা চিন্তা আজকাল ভুলুর মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

এমন সময় একদিন সেই গ্রামোফোন কোম্পানির ভদ্রলোক এলেন দুপুরে ওকে খুঁজতে খুঁজতে ওদের বস্তিতে। ফট্‌কেই ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ভুলুর গানের রেকর্ডটা নাকি ভালোই বিক্রি হয়েছে। তাই কর্তৃপক্ষ ভুলুর আরও দু-একটা গানের রেকর্ড করতে চান ভুলুকে দিয়ে।

ফট্‌কে ব্যাপারটা জানত না। ভদ্রলোকের মুখে ভুলুর গানের রেকর্ড বের হয়েছে শুনে তো ও অবাক!

তাদেরই মতো নগণ্য ভুলু—রাস্তায় বসে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করে, তারও কিনা রেকর্ড হয়েছে গানের!

দোকান, রেস্তোরাঁয় ফট্‌কে রেকর্ডের গান বাজাতে শুনেছে। দু-একটা গান সে এক-আধ লাইন গাইতেও পারে।

ভদ্রলোক বললেন, এবারে ভুলুকে গানের জন্য কিছু বেশীই দেবে কর্তৃপক্ষ।

ভুলু বলে, সে রাজী আছে।

ভদ্রলোক দু-একদিনের মধ্যেই আবার আসবেন বলে চলে যান।

চুপচাপ ভুলু ঘরের মধ্যে বসে ছিল। ফট্‌কে এসে ভুলুর সামনে দাঁড়াল একসময় এবং মৃদু কুণ্ঠিত কণ্ঠে ডাকল, ভুলু!

কে?

আমি।

ফট্‌কে? আয়। কিছু বলবি?

হ্যাঁরে, সত্যিই তুই রেকর্ডে গান দিয়েছিস ভুলু!

ভুলু মৃদু হেসে বলে, হ্যাঁ।

হ্যাঁরে, ভালো গান গাইতে পারলেই রেকর্ডে দেওয়া যায়, না?

বোধ হয়। ভুলু জবাব দেয়।

পয়সাও পাওয়া যায়?

যায়।

আমাকে গান শিখিয়ে দিবি ভুলু ?

তুই গান গাইতে পারিস ?

একটু-আধটু পারি।

বেশ তো। তাহলে চেষ্টা করলেই পারবি।

পারব ? সত্যি বলছিস তুই, পারব ?

কেন পারবি না ? চেষ্টা করলে হবে না এমন কাজ কিছু আছে নাকি এ জগতে ?

তবে রোজ দুপুরে তোর কাছে আমি আসব। আমাকে কিন্তু তোর গান শিখিয়ে দিতে হবে ভুলু।

এমনি করেই বোধ হয় একজনের দেখে সমবয়সী আর একজনের মনে স্পৃহা জাগে।

দেখতে দেখতে আরো দুটো মাস কেটে গেল।

সেদিন পরীক্ষার ফল বের হয়েছে এবং দেখা গেল লালু খুব ভালো ভাবেই প্রথম বিভাগে পাস করেছে।

স্কুলের অফিস থেকে পরীক্ষার ফল জেনে বের হবার সময় হঠাৎ আজ লালুর তার স্বর্গত হেডমাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন পরে আরও একজনের মুখখানা মনে পড়ল।

মনে পড়ল তার আজকের এই সাফল্যের শুরুতেই একজনের ত্যাগ ও প্রাণপণ চেষ্টা না থাকলে আজকের এই প্রাপ্যটুকু তার তো মিলত না।

মনে পড়ল আজ আবার নতুন করে—সেদিন ভুলু তাকে এমনি করে আশা, উৎসাহ ও খরচ যুগিয়ে যদি না এগিয়ে দিত তবে আজকের এ সাফল্য তার কোথায় থাকত ?

মনে পড়ছে আজ ভুলুর সেই কথা, তুই সফল হতে যদি পারিস সেই তো হবে আমার সবার বড় পাওয়া, সব কষ্ট সার্থক হবে। তোর সাফল্যের মধ্যে দিয়েই আমি বেঁচে থাকব।

সে পড়ছে আর শীতের রাতে তারই পড়বার খরচ যোগাতে কিভাবে ছিন্ন একবস্ত্রে ভুলু গান গেয়ে গেয়ে পয়সা উপার্জন করছে রাস্তায় বসে।

নিজে না খেয়ে তার মুখে পুষ্টিকর খাদ্য তুলে দিয়েছে দিনের পর দিন। নিজে না পরে তার গায়ে দিয়েছে বস্ত্র।

ভুলু। হ্যাঁ ভুলু—ভুলুই আজ তার সাফল্যের মূল।

এই যে ললিতমোহন! এখানে দাঁড়িয়ে তুমি, তোমাকে একটা কথা বলবার জন্য যে আমি খুঁজছিলাম!

চেয়ে দেখে লালু সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্কুলের অ্যাকাউনটেণ্টবাবু।

॥ সাতাশ ॥

স্কুলের অ্যাকাউনটেণ্ট রমেনবাবু শুধু বিস্মিত নয়, স্তম্ভিতও হয়ে গিয়েছিলেন যেদিন ভুলু এসে লালুর ফিসের টাকা স্কুলে জমা দিয়ে যায়। এতকাল তাঁদের পরিচিত সমাজের বাইরে ঐ যে-সব অবহেলিত গৃহহারা ছন্নছাড়ার দল, শিক্ষার অভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি ও নোংরা ছিন্ন মলিন বেশভূষায় ঘুরে বেড়ায়, তাদের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশও তিনি পান নি সমাজের আরো অন্যান্য দশজনের মতোই। ছোটলোক আবর্জনা ভেবে যথাসাধ্য এড়িয়েই চলেছেন। কিন্তু সেদিন তাদেরই একজন অন্ধ ভুলুর ব্যবহার ও কথাবার্তা শুনে হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন।

লালুর ফিসের টাকা জমা দিয়ে ভুলু চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোনো কাজকর্মই যেন করতে পারলেন না।

টিফিনের ছুটি তখন। স্কুলের কমপাউণ্ডে ছেলের দল হৈ-হৈ করে খেলা করছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল, ঐ যে সব ভালো ভালো বেশভূষা-পরা সুন্দর ছেলের দল, ওদের সঙ্গে একটু আগে বলতে গেলে যে রাস্তারই অন্ধ ছেলেটি এসে

তার বন্ধুর ফিসের টাকা জমা দিয়ে গেল তার প্রভেদ কোথায়! পারবে কি ওদের মধ্যে কেউ আজ অন্ধ ছেলেটির মতো তার বন্ধুর জন্য আত্মত্যাগ করতে!

কতকগুলো পাঠ্য পুস্তকের বুলি মুখস্থ করে নির্ভুলভাবে উগড়ে পরীক্ষায় পাস করাই কি শিক্ষার একমাত্র মানদণ্ড? তা ছাড়া ওরা আর কীই বা শিখছে?

কেমন একটু কৌতুহল হল রমেনবাবুর। তিনি পরদিন সন্ধান নিয়ে বস্তিতে গিয়ে ফটিকের সঙ্গে দেখা করলেন এবং সেখানে ভুতোর মার মুখেই একটু একটু করে লালু-ভুলুর সমস্ত ইতিহাস জেনে নিলেন। অন্ধ ভুলুর কথা শুনে শ্রদ্ধায় তাঁর মন যেন ভরে গেল।

বিপর্যয় ও দুর্যোগের মধ্যেও একটি অন্ধ কিশোর যে মাথা তুলে বেঁচে থাকবার কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করেছে এবং শুধু তাই নয়, তারই মতো অসহায় আর এক খঞ্জ কিশোরকে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা করেছে, ভুতোর মার মুখে সেই কাহিনী শুনে রমেনবাবু যেন এক নতুন শিক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন এবং বাড়ি ফিরবার পথে এই কথাটাই তাঁর বার বার মনে হতে লাগল, এত বড় আদর্শ দারিদ্র্যের আঘাতে কেমন করে শেষ হয়ে যেতে বসেছে আজ! আবর্জনার স্তূপে পড়ে আজ একটা হীরা কেমন করেই না চাপা পড়তে চলেছে!

তাই সেদিন লালু যখন তার পরীক্ষায় কৃতকার্যতার সংবাদ দিয়ে, স্কুলের নবনিযুক্ত হেডমাস্টার মহাশয়ের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে আসছে, দেখতে পেয়ে রমেনবাবু তাকে ডাকলেন, ললিতমোহন! শুনে যাও।

লালু রমেনবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল তাঁর ডাক শুনে।

অফিস-ঘরে এসো ললিত, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অফিস-ঘরে ঢুকে একটা টুল দেখিয়ে বললেন, বোসো ললিত।

লালু বসল।

ললিত, ফিসের অভাবে তোমার পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছিল না তোমার

মনে আছে নিশ্চয়ই ?

আছে।

কিন্তু সেই ফিসের টাকা তোমার কোথা থেকে কেমন করে এল তা কি জান ?

জানি রমেনবাবু, স্কুল-কমিটি দয়া করে আমার পরীক্ষার ফিসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

না। স্কুলের কমিটি তোমার ফিসের টাকা দেন নি। অবিশ্যি কুলদাবাবু তোমার হয়ে স্কুল-কমিটির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু কুলদাবাবুই তোমার সব খরচ চালাচ্ছিলেন বলে এবং আগেই অন্য একটি ছেলের ফিসের টাকা দেওয়া হবে সাব্যস্ত হওয়ায় কুলদাবাবুর আবেদন কমিটি রক্ষা করতে পারে নি।

সত্যি-সত্যিই তাহলে স্কুল-কমিটি আমার ফিস দেন নি।

না।

তবে ? তবে কে দিল আমার ফিস রমেনবাবু ?

যে তোমার ফিস জমা দিয়ে যায় সে বার বার আমাকে নিষেধ করে গিয়েছিল তার নাম তোমার কাছে না করতে, পাছে তুমি পরীক্ষা দিতে অস্বীকার কর সে ফিসের টাকা দিয়েছে শুনলে। তাই তোমাকে এতদিন জানাই নি সে কথা।

বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয়ই সে। হ্যাঁ, সে-ই নিশ্চয়ই আমার ফিসের টাকা দিয়েছে। বলুন—বলুন রমেনবাবু, তার নাম কি ভুলু। অন্ধ কি সে।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। সেই তোমার ফিসের টাকা জমা দিয়ে গিয়েছে।

সত্যি। অপরাধের আমার সীমা নেই রমেনবাবু। গরীবদের সঙ্গে বস্তিতে সে থাকে, গান গেয়ে উপার্জন করে বলে তাকে আমি লজ্জায় ঘৃণায় একদিন ত্যাগ করে এসেছিলাম। কিন্তু তবু সে আমাকে ত্যাগ করে নি। দু চোখ বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে

পড়ে। লালু বলে, যাচ্ছি। এখুনি আমি যাচ্ছি তার কাছে—

হ্যাঁ যাও। আর মনে রেখো, পুঁথির বিদ্যা-অর্জন করাই সবটুকু নয়। দুটো ফরসা জামা-কাপড় গায়ে চড়িয়ে দু' পাতা লেখাপড়া শিখলেই যেমন জাতে ওঠা যায় না, তেমনি অবস্থা-বিপর্যয়ে শিক্ষার অভাবে যারা আজ সমাজের নীচের তলায় ছিটকে পড়েছে বা জন্মেছে, তারাও জাতিচ্যুত হয়ে যায় নি চিরদিনের মতো।

ক্রাচে ভর দিয়ে খটখট করে ছুটতে ছুটতেই যেন লালু বহুদিন পরে আবার তাদের সেই পরিচিত বস্তির সামনে এসে দাঁড়াল। চিৎকার করে ডাকল, ভুলু! ভুলু!

কিন্তু কোথায় ভুলু?

পরিচিত ঘরের সেই দরজাটার শিকল তোলা।

লালু আবার ডাকল, ভুলু! ভুলু!

বস্তির একটা ছেলে রতন, বড় রাস্তায় চায়ের দোকানের কাজ থেকে সবে বস্তিতে ফিরছে তখন। লালুকে দেখে দাঁড়াল।

কে? লালু না?

হ্যাঁ। ভুলু কোথায় জান?

ভুলু? সেই অন্ধ?

হ্যাঁ।

সে তো এখানে নেই।

কোথায়—কোথায় সে?

জ্বরে পড়েছিল, আজ তিনদিন আগে অ্যাম্বুলেন্স এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

হাসপাতালে? কোন্ হাসপাতালে?

তা তো জানি না। খুঁজে দেখো না।

ভুতোর মা? ভুতোর মা কোথায় জান?

জানি না।

লালু বস্তি থেকে বের হয়ে এল। যেমন করে হোক ভুলুকে

আজ তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। যেমন করে হোক ভুলুর কাছে আজ তার সমস্ত অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিতেই হবে। খটখট করে লালু ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে চলে।

হাসপাতাল! কোন্ হাসপাতালে ভুলু!

॥ আটাশ ॥

শুধু যে অনুতপ্ত লালুই সেদিন এসে বস্তির ছোট্ট ঘরখানির দরজায় শিকল তোলা, তালা বন্ধ দেখেছিল তাই নয়। শুধু লালুকেই একা ফিরে যেতে হয় নি সেদিন। আর একজনও অনেক খুঁজতে খুঁজতে ভুলুর সন্ধানে এসে অমনি দরজায় শিকল তোলা দেখেছিল, মাত্র তার আগের দিনই। ভুলুর দিদি বীণা।

সেদিন বীণার পরিচয়কে অস্বীকার করে অন্ধ ভুলু যখন হোঁচট খেতে খেতে প্রায় ছুটতে ছুটতে মণিকাদের বাড়ি থেকে চলে যায়, সেদিনই বীণা বুঝতে পেরেছিল ভুলু আর জীবনে কোনোদিনও ও বাড়িতে ফিরে আসবে না,—তা মণিকা তাকে যতই সান্ত্বনা দিক না কেন। এবং আসবে না কেবল তারই জন্য। তাই বীণা বাড়ি ফিরবার আগে অনেক করে যতটা সম্ভব মণিকার কাছ থেকে ভুলুর সংবাদ গ্রহণ করে নিয়েছিল।

ভুলুর সেদিনকার প্রত্যাখ্যানে বীণার ভুয়ো শিক্ষা ও আভিজাত্যের বুনিয়াদটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যাখ্যানের ভিতর দিয়েই সে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বীণাকে, অবস্থার বিপর্যয়ে আজ সে পথের ধূলায় ছিটকে পড়লেও তার সত্যিকারের আভিজাত্য ও মর্যাদাটা আজও সে হারায় নি। সে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল দিদিকে, বস্তির নোংরা অন্ধকার জীবনের মধ্যে এসে দাঁড়ালেই কেউ সত্যিকারের ছোট হয়ে যায় না। জাতিবৈশিষ্ট্য হারায় না।

কত তুচ্ছ ও সামান্য কারণে বীণা যে সেদিন তাকে পথের ধারে চিনেও মুখ ঘুরিয়ে চলে এসেছিল, ভাবতে গিয়ে নিজেকেই তার নিজের অত্যন্ত ছোট মনে হচ্ছিল আজ।

বীণার স্কুল গেল, চাকরি গেল, পরদিন থেকে কলকাতা শহরের সর্বত্র ভুলুর খোঁজে বেড়াতে লাগল। সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভুলুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কলকাতা শহবে নীচুতল্লাব হতভাগ্যের আস্তানা তো একটা নয় এবং গান করে ভিক্ষা করবাব জন্য রাস্তাও একটা নয়।

ঘুবে ঘুরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে শুধায়, হ্যাঁগা, এখানে ভুলু নামে একটি অন্ধ কিশোর আছে কি? বলতে পার?

বস্তির লোকেরা অবাক হয়ে তাকায় বীণার চেহারা আর বেশভূষার দিকে। কেউ বলে, জানি না। কেউ বলে, সেরকম কেউ এখানে থাকে না তো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘুবতে ঘুবতে একদিন বীণা সন্ধ্যার ঠিক মুখে ভুলুর আস্তানার সামনেই এসে হাজির হয়।

বস্তি-বাসিন্দারা তখন দু' একজন করে কাজ থেকে ফিরছে। ছোট একটা অপরিসর নোংরা গলির মুখে ভূতোর মার সঙ্গে বীণার মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়।

ভূতোর মা-ই প্রথমে কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করে, কে গো তুমি?

আমি!

হ্যাঁ।

আমি—আমি একজনকে খুঁজছি।

খুঁজছ? কাকে?

একটি অন্ধ কিশোরকে। খুব সুন্দর গান গায় সে।

ভুতোর মা চমকে উঠে শুধায়, কি নাম তার জান?

ভুলু।

চমকে ওঠে ভূতোর মা। বলে, হ্যাঁ, জানি।

সত্যি ? সত্যি জান সে কোথায় থাকে ?

হ্যাঁ।

কোথায়, এইখানেই কি ?

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কে বাছা ? আর কেনই বা তাকে খুঁজছ ?

আজ আর মিথ্যে অভিমান নেই, তাই স্বীকৃতিতেও কোনো দ্বিধা বা সংকোচ নেই।

বীণা বলে, আমি তার দিদি।

কথাটা শুনে যেন আর একবার চমকে ওঠে ভূতোর মা।

গোধূলির আবছা আলোয় আর একবার আগন্তুকের দিকে তাকায়। বলে, তুমি তার দিদি ? কেমন দিদি ?

ওগো, আমি তার আপনার দিদি। এক মায়ের পেটের ভাই-বোন আমরা। কিন্তু কোথায় সে ? একটিবার তার কাছে আমায় নিয়ে চলো না ? করুণ ব্যগ্রতা যেন বীণার কণ্ঠ হতে কান্নার মতোই ঝরে পড়ে।

তুমি তার দিদি! কিন্তু কই তার মুখে তো কোনোদিন তোমার কথা আমি শুনি নি, আর তুমিও তো কখনও আস নি!

না আসিনি, হতভাগী যে আমি। আর সে অভিমান করে বলে নি গো, অভিমান করে বলে নি। কিন্তু আর দেরি কোরো না, তার কাছে আমায় নিয়ে চলো।

কিন্তু সে তো নেই।

নেই! একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে বীণা। বলে, কি—কি হয়েছিল তার বলো ? বলো ?

সে এখানে নেই। হাসপাতালে।

হাসপাতালে ? কেন, অসুখ ?

হ্যাঁ, আমি দুদিনের জন্য তারকেশ্বর গিয়েছিলাম, পোড়াকপাল আমার, বেচারী নাকি খুব অসুখে পড়েছিল, এখানকার লোকে

অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

কি অসুখ হয়েছিল জান ?

না। শুনেছি জ্বরে নাকি অজ্ঞান হয়ে ছিল পুরো একটা দিন একটা রাত।

ও। তা কোন্ হাসপাতালে তাকে নিয়ে গেছে ?

তাও জানি না। এরা বলতে পারে না। আমিও তো কাল থেকে হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরছি—কোন খোঁজ এখনও পাই নি।

থপ করে মাটির উপরেই বসে পড়ে বীণা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গলির মধ্যে।

দু চোখ বেয়ে তার ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে।

একটা আর্ত কাকুতি বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। ভুলু! ভুলু ভাই! তারপর একসময় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় বীণা। যাবার জন্যে বোধ হয় পা বাড়ায়।

ভুতোব মা জিজ্ঞাসা করে, কোথা যাচ্ছ ?

দেখি হাসপাতালে খোঁজ করে। টলতে টলতেই বীণা অন্ধকারে গলির মুখে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ভুলু! ভুলু! ভুলু হাসপাতালে ? কোন্ হাসপাতালে ?

রাস্তায় এসে পড়ে বীণা হাঁটতে শুরু করে। চারিদিকে শহরের আলোগুলো তখন জ্বলে উঠেছে। রাতের শহরে আলোর জাদুস্পর্শ লেগেছে।

॥ উনত্রিশ ॥

কয়েকদিন থেকেই ভুলুর মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যার দিকটায় অল্প অল্প জ্বর আসে। চোখমুখ জ্বালা করে, কেমন পিপাসা পায়। সঙ্গে খুসখুসে একটা কাশি, গলাটা ব্যথা করে। হাত-পাগুলো যেন ভেঙে

আসে। এত দুর্বল লাগে যে, এক পা চলতেও যেন ইচ্ছা হয় না। পরিচিত দৃশ্যমান জগৎটা একদা একটু একটু করে চোখের পাতা থেকে মুছে গিয়েছিল। তারপর সবই অন্ধকার। আলো নেই, শুধু শব্দ। পরিচিত জগৎটাকে ভুলু সেই শব্দের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই যেন চোখের দৃষ্টি হারিয়ে সেদিন নতুন করে ভালোবেসেছিল। এবং সেই ভালোবাসার মধ্য দিয়েই নতুন করে বেঁচে থাকবাব জন্য যেন সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল।

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞার মূলটা যেন আজ দুর্বল হয়ে ভেঙে গেছে কখন একটু একটু করে। তাই আজ বাঁচবার যে ইচ্ছাটা সেটাও যেন আর মনের মধ্যে খুঁজে পায় না ও। লালু একান্ত নিষ্ঠুরের মতো তাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর মনকে এই বলেই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল, লালু ছাড়াও বেঁচে থাকা যায় এটা যেন সে প্রমাণ করতে পারে। অকালে অন্ধ হয়ে শত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও যে সে জনারণ্যের মধ্যে হারিয়ে গেল না, এটুকু সান্ত্বনা যেন তার থাকে জীবনে।

কিন্তু ভাঙন-ধরা দেহ তার সঙ্গে শত্রুতা করতে লাগল। ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল ভুলু।

সেদিন রোজকার মতো পথের ধারে গিয়ে গান গাইতে বসে দু-দুবার চেষ্টা করেও গান গাইতে যেতেই খুকখুক করে কাশি আসতে লাগল কেবলই এবং কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে। মাথাটা দপদপ করছে। উঠে পড়লো ভুলু। কোনোমতে লাঠিটা হাতে ঠুকঠুক করে হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরে ফিরে এল ভুলু।

জ্বরে তখন তার গা পুড়ে যাচ্ছে। হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকারেই ঘরের মেঝেতে পাতা শয্যাটার উপরে গা এলিয়ে দিল। সারাটা রাত যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেল টেরই পেল না ভুলু। ভোরের দিকে ঘাম দিয়ে জ্বরটা একটু কম হয়েছে—তখন ভুতোর মা এসে ঘরে ঢুকল।

গত রাত্রে ভুতোর মা যখন খাবার নিয়ে আসে, ওকে জ্বরের ঘোরে পড়ে থাকতে দেখে এবং দু-চারবার ডেকেও কোনো সাড়া না পেয়ে ভেবেছিল বুঝি ও ঘুমোচ্ছে। আর ডাকাডাকি করে নি। কারণ মধ্যে মধ্যে অমনি ভুলু ঘুমিয়ে থাকত, পরে একসময় উঠে খেত।

কিন্তু আজ ঘরে ঢুকে দেখল ভাতের থালাটার ঢাকনিটা খোলা এবং ইঁদুরে সমস্ত ঘরময় ভাত ছড়িয়ে রেখেছে। বুঝল, কাল রাতে ভুলু উঠে খায় নি।

জিজ্ঞাসা করে ভূতোর মা, কাল খাস নি কেন রে ভুলু!

খিদে ছিল না মাসী।

তা বেশ করেছিস। দেখ, আজ আমি একটু তারকেশ্বর যাব। কাল সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব।

তা বেশ তো, যাও না।

ও-ঘরের মানদাকে বলে গেলাম। তোকে চারটি রেঁধে দেবে'খন।

আচ্ছা।

ভূতোর মা জানতেও পারল না এবং ভুলু নিজে থেকেও বললে না তার অসুখের কথা।

ভূতোর মা নিশ্চিন্তেই চলে গেল তারকেশ্বর। এবং পরের দিন তো নয়ই, তার পরের দিনও তারকেশ্বর থেকে ফিরতে পারল না।

এদিকে সেই দিনই দুপুরের দিক থেকে ভুলুর জ্বর বড্ড বেড়ে গেল।

সমস্ত দিন আর জ্বর ছাড়ল না দেখে ভুলু নিজেই চিন্তিত হয়ে ওঠে।

এমনি করে জ্বরের ঘোরে পড়ে থাকলে এখানে তাকে যে কেউ দেখবার নেই তা সে জানে এবং সমস্ত দিন ও রাত ভূতোর মার ফিরবার আশায় আশায় থেকেও যখন সে ফিরল না তখন ঐ জ্বর নিয়ে বস্তির ঐ ঘরে একা একা পড়ে থাকতে ভুলুর আর সাহস হল না।

ফট্‌কে এসেছিল ওর খোঁজে। তাকে ভুলু বললে, একটা কাজ করতে পারবি ফট্‌কে?

কী রে?

একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আমাকে কোনো হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে পারবি?

কেন পারব না? নিশ্চয় পারব।

বড় রাস্তার উপরেই যে ডাক্তারখানা—তার ডাক্তারবাবুকে গিয়ে ভুলুর অনুরোধটা ফট্‌কে জানাল। ডাক্তারবাবুই ফোন করে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাত্রি আটটার সময় অ্যাম্বুলেন্স এসে যখন ভুলুকে স্ট্রেচারে করে বস্তির ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেল, জ্বরের ঘোরে তখন সে অচৈতন্য। ভুল বকছে সে।

অ্যাম্বুলেন্স এসে একটা হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এল ভুলুকে।

সে রাতটা ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের একটা বিছানায় বলতে গেলে একপ্রকার বিনা চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায় জ্বরের ঘোরেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রইল ভুলু।

ইমারজেন্সি ওয়ার্ড সেদিন নানা রোগীতে ভর্তি। একপাশে ফেলে রেখে দেওয়া হল অচৈতন্য ভুলুকে।

পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় ডাক্তার এলেন; তখন ভুলু জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে।

রোগীকে পরীক্ষা করতেই ডাক্তারের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। নিউমোনিয়া তো বটেই এবং সেই সঙ্গে ক্ষয়রোগ বাসা বেঁধেছে ভুলুর বুকে। ডাক্তার বললেন, ক্ষয়রোগ অনেক পূর্বেই গলনালীতে শুরু হয়েছিল। সেখান থেকেই বীজাণু ছড়িয়েছে ফুসফুসে।

নাম-ধাম কিছুই পাওয়া গেল না তার।

ডাক্তার তখুনি ভুলুকে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিলেন।

দুদিন পরে ভুলুর জ্ঞান ফিরে এল কিন্তু তখনও সব অস্পষ্ট

খোঁয়াটে। নার্স পাশেই দাঁড়িয়েছিল, কি যেন সে জিজ্ঞাসাও করল ভুলুকে, কিন্তু ভুলু জড়ানো স্বরে কি যেন বিড়বিড় করে বলল তা সে বুঝতে পারল না।

পরের দিন সকালে আবার ভুলু চোখ মেলে তাকাল।

কিন্তু বুঝতে পারল না এ সে কোথায় এসেছে তার অন্ধ দৃষ্টি দিয়ে।

চারপাশে সারি সারি খাটের উপরে লাল কম্বলে ঢাকা রোগীরা শুয়ে আছে, কিছুই তার চোখে পড়ল না। কেবল নাকে এল বিচিত্র একটা ওষুধের কটু গন্ধ ঘরের বাতাসে। শ্বাস নিতেও ভুলুর কষ্ট হচ্ছে।

ক্ষীণ কণ্ঠে ভুলু ডাকল, মাসী?

কিন্তু কারো কানেই সেই ক্ষীণ ডাকটি প্রবেশ করে না।

ভুলু আবার চোখ বুজল।

॥ ত্রিশ ॥

মাঝরাত্রে আবার ভুলু চোখ মেলে তাকাল, ডাকল মৃদুকণ্ঠে,—মাসী!

অন্ধ চোখে দৃষ্টি তো নেই, তাই কিবা দিন কিবা রাত্রি!

মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় সমস্ত হাসপাতালটা তখন যেন বিরাট একটা কবরখানার মতোই নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

মস্ত বড় লম্বা হলঘর। সারি সারি লোহার বেডে লাল কম্বলে ঢাকা নানাবয়েসী রোগীরা সব শুয়ে রয়েছে। তার মধ্যে কেউ কেউ ঘুমাচ্ছে, কেউ কেউ বা রোগের যাতনায় অস্ফুট কাতরোক্তি করছে। অল্প পাওয়ারের সাদা ডোমে ঢাকা আলোগুলো, যা সামান্য আলো দিচ্ছে তাতে সব অস্পষ্ট আবছা মনে হয়।

বড় বড় কাচের জানালাগুলো খোলা। মধ্যশীতের হিমের

বায়ু ঝিরঝির করে অবাধে এসে ঢোকে ঘরের মধ্যে।

লম্বা ওয়ার্ডটার ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল। তার উপরে নানাপ্রকারের ওষুধের ছোট বড় মাঝারি শিশি।

রাত্রের ডিউটি-নার্স রিপোর্ট বুকে কি যেন লিখছিল। তার কানে গেল সেই মৃদু ডাক, মাসী।

রাত্রির স্তব্ধতায় সেই দুই অক্ষরের ক্ষীণ কণ্ঠের মাসী ডাকটি যেন হঠাৎ নার্সের কানে এসে কি এক সুরে বাজল।

লেখা থামিয়ে চকিতে মুখ তুলে তাকাল নার্স।

মাসী। আবার ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হল ডাকটি।

খাতা কলম টেবিলের উপরেই রেখে এগিয়ে গেল নার্স, কৌতূহলে এগিয়ে চলল দুদিকে তাকাতে তাকাতে।

মাসী। বড্ড শীত করছে মাসী, গায়ের কাপড়টা আমার ঠিক করে দাও না মাসী।

১৬নং বেড়ের সামনে এসে দাঁড়াল নার্স।

নতুন কিশোর ভিখারী পেসেণ্টটি। নিউমোনিয়ার সঙ্গে ক্ষয় রোগ—টি. বি.। সন্ধ্যাবেলা ডিউটিতে এসেই কোন্ রোগীর কি অবস্থা দেখতে গিয়ে তার আগেকার ডিউটি-নার্সের ডিউটি নোটে ওর চোখ পড়েছিল: ১৬নং বেডের রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। প্রয়োজন হলে যেন আর. পি. রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ানকে সংবাদ দেওয়া হয়—হাউস-স্টাফের ডক্টর মুখার্জির নোট দেওয়া আছে।

১৬নং বেডের রোগীর শিয়রের কাছটাতে এসে দাঁড়াল নার্স।

টেম্পারেচার চার্টে দেখল রাত্রি আটটায় যে শেষ টেম্পারেচার নেওয়া হয়েছে তাও ১০৩°-এর উপরে।

প্যাসেজ ও সিঁড়ির আলোর খানিকটা রোগীর মুখে এসে পড়েছে।

চোখ দুটি বোজা।

নার্স রোগীর কপালে হাত ছোঁয়াল। ঠাণ্ডা নরম হাতের স্পর্শে

রোগী আবার অন্ধ চোখ মেলে তাকাল, মাসী!

খুব কি কষ্ট হচ্ছে? নার্স জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু সে প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না ১৬নং রোগী ভুলু। আপন খেয়ালেই যেন পূর্ববৎ বলে চলে, পুরানো যে কোটটা দেওয়ালে ঝোলানো আছে তার বুকপকেটে একটা খামের মধ্যে চল্লিশটা টাকা আছে মাসী। লালু নিশ্চয় পাস করবে মাসী। কলেজে পড়বে তো। তাকে টাকাগুলো দিও মাসী। ফটিকের হাত দিয়ে স্কুলের অ্যাকাউনটেণ্ট রমেনবাবুকে পাঠিয়ে দিও। শুনতে পাচ্ছ মাসী?

অবাক হয়ে ভুলুর কথাগুলো শুনছিল নার্স। একটি বর্ণও যদিও তার বুঝতে পারছিল না তবু এটা সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, সেগুলো জ্বরের ঘোরে বললেও ভুল-বকা বা আবোল-তাবোল কথা নয়। সুসংবদ্ধ কথা, মানে সে তার অর্থ না বুঝলেও প্রত্যেকটি কথারই অর্থ আছে।

তাই হঠাৎ কি ভেবে সে বললে মৃদু কণ্ঠে, হ্যাঁ।

বোলো না তাকে যেন আবার ও টাকা তাকে আমি দিয়েছি। তাহলে কিন্তু নেবে না। বুঝেছ? আবার ভুলু বলে।

হ্যাঁ, বুঝেছি। তুমি এবার ঘুমোও তো।

হঠাৎ, যেন এবারে নার্সের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে ভুলু, কে! কে আপনি?

আমি হাসপাতালের নার্স।

ওঃ আমি—আমি বুঝি হাসপাতালে?

হ্যাঁ।

এবারে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ভুলু, তারপর আবার বলে, তাহলে—

তাহলে কি?

তাহলে মাসীকে তো বলা হল না!

আমি বলে দেব।

দেবেন ? সত্যিই বলে দেবেন ?

হ্যাঁ দেব বৈকি। তুমি ঘুমোও।

নার্স পাশে বসে রোগীর কপালে হাত রাখতেই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল।

তপ্ত খোলার মতো যেন জ্বরে গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে নার্স টেবিলের উপর থেকে থার্মোমিটারটা নিয়ে এল।

থার্মোমিটারে জ্বরের তাপমাত্রা দেখে চমকে উঠল নার্স। ১০৪° -ডিগ্রী।

তাড়াতাড়ি একটা স্লিপ লিখে নার্স ওয়ার্ডের একটা সুইপারের হাতে আর. পি.-র কোয়ার্টারে আর্জেন্ট কল দিয়ে প্যঠিয়ে দিল।

পনের মিনিটের মধ্যেই আর. পি. ছুটে এলেন।

ডক্টর সেন, ১৬নং রোগীর টেমপারেচার বাড়ছে। নার্স ব্যাকুল কণ্ঠে বললে '

পাল্‌স্‌ দেখেছেন ?

হ্যাঁ, খুব র‍্যাপিড ও ফীব্‌ল্‌। সঙ্গে ডিলিরিয়ামও চলেছে।

চলুন, আবার টেমপারেচার নিন।

আবার টেমপারেচার নেওয়া হল, এবারে দেখা গেল ১০৪-৫°। আরো বেড়েছে জ্বর।

মাথায় আইসব্যাগ দিন, একটা কোরামিন রেডি করুন। ডাঃ সেন বললেন।

ভুলু তখন মৃদু কণ্ঠে সত্যিসত্যিই ভুল বকে চলেছে।

লালু! এসেছিস ভাই! আমি জানতাম রে জানতাম। একদিন তুই আবার ফিরে আসবি। তারপরই আবার একটু থেমে বলে, দরজাটা—দরজাটা খুলে দাও না মাসী। শুনছ না লালু এসেছে, সে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ও বড় অভিমানী মাসী, দরজা না খুললে ও চলে যাবে। আর আসবে না। কই। খুলে দিলে দরজাটা?

খুলে দাও। মাসী—

হঠাৎ একটা কাশির ধমক এল, কাশতে শুরু করে ভুলু। কাশতে কাশতে মনে হচ্ছে ওর বুকের পাঁজরগুলো যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ কাশতে কাশতে একটা হেঁচকি উঠলো। এক ঝলক রক্ত গড়িয়ে পড়ল বালিশের উপরে।

মাসী!—মাসী!

একটা মৃদু ধাক্কায় বস্তির ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে গেল এবং সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ভূতোর মার।

হঠাৎ যেন আপন মনেই চিৎকার করে ওঠে ভূতোর মা, ভুলু!

কিন্তু কোথায় ভুলু?

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পারুল, সে বলছে, কাজে যাবি না দিদি? ভোর হয়ে গেছে যে!

॥ একত্রিশ ॥

ভুলুর মাথাটা বালিশের উপরে কাশতে কাশতে হঠাৎ এলিয়ে পড়তেই নার্স অর্ধস্ফুট কণ্ঠে ডেকে উঠল, ডক্টর সেন, কুইক!

ডাঃ সেন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আর একটা ইনজেকশন রেডি করছিলেন।

নার্সের ভীত উৎকণ্ঠিত ডাকে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন,—ইয়েস্! ভুলুর অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ি দেখতে দেখতে বললেন,—কুইক, অক্সিজেন সিলিণ্ডারটা নিয়ে আস্থন। অক্সিজেন দিতে হবে এখুনি। কিন্তু তার আগে মুখটা মুছিয়ে দিন।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভুলুর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন যেন দেখা গেল।

ভুলু ঘুমোয় শান্ত হয়ে।

সারাটা রাত্রি কলেজ স্ট্রীটের শেডের নীচে বসে কাটিয়ে ক্রাচটা নিয়ে লালু আবার উঠে দাঁড়াল।

জাগরণ-ক্লান্ত দু'চোখের পাতা জ্বালা করছে।

শহরের সমস্ত হাসপাতালগুলোতেই লালু অনুসন্ধান করেছে ভুলুর, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় নি।

তবু সে নিরাশ হয় নি। ভুলুকে তার খুঁজে বের করতেই হবে। যেমন করে হোক, খুঁজে বের করে যে ক্ষমা তার কাছে চেয়ে নিতেই হবে। শুধু কি তাই ? তার পরীক্ষার পাসের সমস্ত আনন্দই যে ব্যর্থ-হয়ে যাবে যদি না সে ভুলুকে তার সাফল্যের সংবাদটা আজ দিতে পারে।

সবে সকাল হয়েছে। দু-একটি ট্রাম ও রিকশা কেবল চলতে শুরু করেছে। ক্বচিৎ এক-আধজন পথিক।

দোকানপাট এখনো খোলেই নি।

ঠুকঠুক করে অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে ক্রাচে ভর দিয়ে কালীতারা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে হঠাৎ একটা কথা কানে যেতেই লালু থমকে দাঁড়াল।

রেডিওতে সকালবেলার প্রথম অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও, কলকাতা। ৩৭০'৪ মিটারে এখনকার অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে, ঘোষকের কণ্ঠ শোনা যায়ঃ সর্বপ্রথম আজ যে রেকর্ডটি বাজাচ্ছি সেটি গেয়েছেন কিশোর অন্ধগায়ক শ্রীমান ভুলু। গানটির প্রথম লাইন হচ্ছে—"নয়নের আলো নিভে গেল যবে জ্বেলে দিলে দীপ অন্তরে—"

ভুলু! ভুলু গাইছে! রেকর্ডে ভুলুর গান!

স্তব্ধ অনড় পাষাণের মতো ক্রাচের উপরে ভর দিয়ে দু কান ভরে লালু শুনতে থাকে ভুলুর গান।

ভুলু গাইছে, চারিদিক অন্ধকারে দৃষ্টি যখন আমার রুদ্ধ, হে

প্রভু অন্তর্যামী, তুমি তখন সেই অন্ধকারে জ্বালালে আবার সোনার প্রদীপটি। আর আমাব ভয় কি! আব আমাব দুঃখ কি! আমার সকল দুঃখের শেষে আজ তুমি যে ধবা দিলে, এই তো আমি সব পেলাম!

হঠাৎ চমক ভাঙল একটি নাবীকণ্ঠেব ডাকে, লালু না।

জলভরা ঝাপসা চোখে ফিরে তাকাল লালু, কে?

ভুলুর দিদি বীণাকে লালু চিনতে পাবে না। কবে একদিন রাস্তার ধারে দেখেছিল, আব তো দেখে নি।

কিন্তু বীণা তাকে দেখেই চিনেছিল, কাবণ সেদিনকাব লালুর রূঢ় কথাগুলো এখনো তো সে ভোলে নি।

আমাকে তুমি চিনতে পাবছ না, না? বীণা আবার শুধায়।

না তো।

কিন্তু তোমাব সেই বন্ধুটি কোথায়? সেই যে অন্ধ, গান গাইত?

জানি না তো।

জান না?

না।

শুনেছি সে নাকি অসুস্থ হয়ে কোন এক হাসপাতালে আছে। আজ তিন দিন খুঁজছি কিন্তু তার কোন সন্ধানই করতে পারি নি।

আপনি—আপনি তার খোঁজ করছেন?

হ্যাঁ, সে আমার ছোট ভাই।

আপনার ভাই! ভুলু আপনার ভাই! বিস্ময়ের যেন আর অবধি থাকে না লালুর।

হ্যাঁ। তুমি তার খোঁজ পাও নি, কিন্তু আমি বোধ হয় তার খোঁজ পেয়েছি, কোন্ হাসপাতালে সে আছে।

পেয়েছেন? কোন্ হাসপাতালে সে আছে? বলুন, শিগগির বলুন?

ব্যস্ত হয়ো না, এসো আমার সঙ্গে। একটা সন্ধান পেয়েছি

কিছুক্ষণ আগে। সেইখানেই যাচ্ছি।

চলুন। আপনার সঙ্গে আমি যাব।

বীণা তার এক বান্ধবীকে সব কথা বলায় এবং তার দাদা একজন বড় ডাক্তার, তিনিই খোঁজ নিয়ে জেনেছেন ভুলুর সংবাদ। কিছুক্ষণ আগে সেই সংবাদ পেয়েই বীণা চলেছিল সেই হাসপাতালে ঐ রাস্তা দিয়ে, এমন সময়ে লালুকে দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়েছিল।

দুজনে তখন এগিয়ে চলে সামনের বিরাট থামওয়ালা হাসপাতালটার দিকে। হাসপাতালে পৌঁছে তার বান্ধবীর দাদা ডাক্তার ঘোষ হাসপাতালের যে ডাক্তারটির নামে চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁর খোঁজ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করল।

তিনি আর কেউ নন।

তিনিই ঐ হাসপাতালের আর. পি. ডাঃ সেন।

ডাঃ সেন বিস্মিত হয়ে বীণার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, সেই ছেলেটি আপনার ভাই? কিন্তু তাকে তো যতদূর জানি বস্তি থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে আনা হয়েছে?

সে অনেক কথা ডাক্তার সেন, পরে সব আপনাকে বলব, এখন আগে বলুন সে কেমন আছে।

অবস্থা রোগীর খুবই খারাপ। কাল রাত্রে একটা ক্রাইসিস্ গেছে।

ডাক্তার সেন, সে বাঁচবে তো?

বাঁচা-মরার কথা কি কেউ বলতে পারে বীণা দেবী? তা ছাড়া আমরা ডাক্তার, আমাদের কাছে যে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

তাকে একটিবার দেখতে পারি কি?

দেখবেন, কিন্তু—

প্লীজ ডাক্তার সেন, দয়া করুন। একটিবার তাকে দেখতে দিন। শুধু দেখেই চলে আসব।

বেশ। আসুন। কিন্তু কোনো গোলমাল করতে পারবেন না,

এমন কি তার খুব কাছেও যেতে পারবেন না। দূর থেকে একবার দেখেই চলে আসতে হবে।

তাই—তাই হবে।

ডাঃ সেন বীণা ও লালুকে সঙ্গে করে ওয়ার্ডের দিকে চললেন।

॥ বত্রিশ ॥

ভুলুর দিদি বীণা ও ক্রাচে ভর দিয়ে লালু ডাঃ সেনকে অনুসরণ করে তাঁর পিছনে পিছনে ভুলুর বেডের অল্প দূরে এসে দাঁড়াল।

যে বেডে ভুলু শুয়েছিল সেই বেডটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ডাঃ সেন দেখালেন, ঐ যে।

শুয়ে আছে ভুলু, চোখ দুটি বোজা, নাকের মধ্যে একটা সরু রবার ক্যাথিটার লাগানো যার সাহায্যে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। গলা পর্যন্ত একটা লাল কম্বল ঢাকা।

ছলছল করে ওঠে বীণার চোখ দুটি।

লালুর চোখের দু কোল বেয়ে নিঃশব্দে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা নেমে আসে।

মাত্র মিনিট দুই ওরা দুজনেই সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত ভুলুর মুখের দিকে।

তারপরই ডাঃ সেন ওদের ইঙ্গিতে জানান, চলুন।

ওরা আবার দুজনেই বের হয়ে এল ডাঃ সেনের সঙ্গে সঙ্গে।

হাসপাতালের বিরাট চওড়া সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে নেমে গেছে। ইতিমধ্যেই আউটডোরে রোগীদের ভিড় জমে উঠেছে। সেই সিঁড়ির সামনে প্যাসেজে ও করিডোরে একটার পর একটা গাড়ি এসে থামছে ভিজিটারসদের।

সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে ওরা এসে দাঁড়াল।

ডক্টর সেন। বীণা ডাকল।— আমার ভাই বাঁচবে তো?

নিরাশার কথা তো আমরা কখনো কাউকে বলি না বীণা দেবী। ভালো হয়ে উঠবে এই আশাই তো করি।

আবার আমরা কখন ওকে দেখতে পাব ডক্টর সেন?

পাঁচটা থেকে সাতটা ভিজিটিং আওয়ার। সেই সময়ে আসবেন।

ওর চিকিৎসার জন্য যদি কোন দামী ওষুধ বা কিছুর দরকার হয় আমি দেব। যেমন করে হোক ওকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু। দেশ বিভাগের বিপর্যয়ে আমাদের সর্বস্ব গেছে, আমরা দুটি ভাই-বোন ছাড়া আর আমাদের কেউ নেই। ওকে বাঁচিয়ে দিন ডক্টর সেন।

মিনতি-করুণ কান্নায় বীণার গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায়। লালু চুপ করেই থাকে। কোনো কথাই বলে না। শয্যাশায়ী ভুলুর ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখখানা দূর থেকে দেখে অবধি তার মনের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে চলেছে তখন।

ভুলুর প্রতি তার সমস্ত অপরাধ যেন ভারী একটা পাথরের মতো তার বুকের মধ্যে চেপে তার শ্বাস রোধ করে আনে।

ভুলুর ক্ষমা যদি সে নাই পেল তবে এই বোঝা সে বইবে কেমন করে?

মনে মনে সে কেবল বলতে থাকে, ভগবান ওকে ভালো করে দাও।

বীণা বাসায় চলে গেল, কিন্তু লালু তার সঙ্গে গেল না। দু-তিনবার বীণা লালুকে তার সঙ্গে যাবার জন্য ডাকল, কিন্তু লালু গেল না।

সারাটা দিন, বলতে গেলে সেই বিকেল চারটে পর্যন্ত, লালু হাসপাতালের গেটের সামনেই ফুটপাথের উপর বসে রইল।

ক্ষুধা তৃষ্ণা তার আর যেন নেই। এক-একবার মনে হচ্ছিল যদি ভুলু না বাঁচে। পরক্ষণেই আবার মনে হয়, না না, ভুলু বাঁচবে, নিশ্চয়ই বাঁচবে।

ফুটপাথের উপর বসে বসে লালুর অতীত দিনের কত কথাই না মনে হচ্ছিল। এই কলকাতা শহরে একদিন তারা দুজনে পাশাপাশি চলেছে। আশ্রয়হীন আচ্ছাদনহীন কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষার রাত্রি-দিনগুলো তাদের পাশাপাশি কেটেছে।

কত সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দের সেসব দিনগুলো। তবু সেদিন ছিল তারা পাশাপাশি, এক প্রাণ, এক আত্মা।

একই সুরে বাঁধা ছিল যেন দুটি বীণার তার।

একজন অন্ধ, একজন খঞ্জ।

একজনের ছিল না পা, একজনের ছিল না দুটি চক্ষু। তবু তারা ছিল সেদিন নির্ভয়। সমস্ত অভাব-অভিযোগ, ব্যর্থতা ও দুঃখের বিরুদ্ধে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বাঁচতে চেয়েছিল।

জীবনকে তারা পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছিল।

কারো সাহায্য চায় নি, কারো কাছে নেয় নি ভিক্ষা। তাদের মিলিত চেষ্টা ও সাধনা দিয়ে বিরূপ ভাগ্যকে তারা সেদিন জয় করতে চেয়েছিল।

সেই সব সুখ-দুঃখ, অশ্রু-হাসি জড়ানো অতীতের খুঁটিনাটিগুলো কেবলই লালুর মনে পড়তে লাগল।

এবং সেই সব কিছুর মধ্যে বেশী করে যেন বার বার ফুটে উঠতে লাগল ভুলুর অদ্ভুত ভালোবাসা, অপূর্ব আত্মত্যাগ, নিরভিমান ব্যবহার। কে—কে তার ভুলু? পথের মাঝে কুড়িয়ে পাওয়া সামান্য পথের সঙ্গী বই তো নয়। পর হতেও পর।

তবু আজ পর্যন্ত তার এই চোদ্দ-পনেরো বছরের জীবনে কই মনে তো পড়ে না লালুর অমন স্নেহ অমন ভালোবাসা আর সে পেয়েছে কোথাও।

অথচ মিথ্যে অভিমানের বশে একদিন ঐ অত বড় ভালোবাসার বুকেই নির্মম আঘাত করে সে চলে গিয়েছিল।

লালুর চোখের কোল বেয়ে ঝরতে থাকে নিঃশব্দ অশ্রুধারা।

পাঁচটা বাজবার প্রায় আধ ঘণ্টা আগেই লালু হাসপাতালের সেই বড় বড় সিঁড়িগুলোর নীচে এসে দাঁড়াবার অল্পক্ষণের মধ্যে বীণাও এসে উপস্থিত হল।

তুজনের নিঃশব্দে চোখাচোখি হল কিন্তু কেউ কোনো কথা বললে না। পাঁচটা—কখন পাঁচটা বাজবে?

দেখতে দেখতে আবো সব রোগীদের দর্শনার্থী আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের ভিড় জমে ওঠে আশেপাশে।

তারপর একসময় ঢং ঢং করে হাসপাতালেব ঘড়িতে পাঁচটা বাজল।

সকলেই এগিয়ে চলে আগ্রহে ওয়ার্ডের দিকে।

ওরাও তুজনে অগ্রসর হল।

ভিতরে ঢুকবার লম্বা প্যাসেজটাব মুখেই ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ডাঃ সেনেব।

ডাঃ সেন বীণাকে দেখেই বলেন, এই যে আপনি এসেছেন, আসুন, ঐ সামনের ঘবটায় চলুন; আপনাব সঙ্গে কথা আছে।

ডাঃ সেনের কথায় কেন জানি ধ্বক করে ওঠে বীণার বুকের ভিতরটা।

কি আবার কথা!

ভুলু—ভুলু বেঁচে আছে তো?

ফ্যালফ্যাল করে বোবা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বীণা ডাঃ সেনের মুখের দিকে। ডাঃ সেন আবার বলেন, আসুন!

॥ তেত্রিশ ॥

ডাঃ সেনের সঙ্গে সঙ্গে বীণা যেন অবশ পা-তুটো কোনোমতে টেনে টেনে ছোট একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। এখনি হয়ত সেই

মর্মান্তিক সংবাদটি উচ্চারিত হবে। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে করা হল না, সেই কথাটিই শেষবারের মতো তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ভুলুর ক্ষমা সে পেল না।

উঃ, ভগবান! ঐ কথাটি শোনবাব আগে যদি সে জন্মের মতোই কালা হয়ে যেত!

পৃথিবীর সমস্ত শব্দ থেমে যেত! সমস্ত কথা ফুরিয়ে যেত!

মুখ তুলে ডাঃ সেনের মুখের দিকেও যেন আর তাকাবার সাহস হচ্ছে না বীণার।

বসুন বীণা দেবী, ডাঃ সেন মৃদু কণ্ঠে বললেন।

কিন্তু বসবে কি বীণা? তার সমস্ত শরীর, সমস্ত অনুভূতি যেন পাথর হয়ে গিয়েছে তখন।

ডাঃ সেন আবার বললেন, বুঝতেই তো পারছেন আপনার ভায়ের অবস্থা!

মড়ার মতো ফ্যাকাশে বোবা দৃষ্টি তুলে তাকাল বীণা ডাঃ সেনের মুখের দিকে।

সব শেষ হয়ে গেছে কি? বলুন ডাঃ সেন, আর গোপন করবেন না!

না। এখনো বেঁচে আছে বটে কিন্তু প্রগনোসিস্ খুব গ্রেভ। আশা খুবই কম। তবু ডাক্তার আমরা, জানেন তো। আশা আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও করি। আর তা ছাড়া এসব রোগে হঠাৎ যেমন শেষ হয়ে যেতে পারে, তেমনি আবার শেষ হতে হতেও অনেক দিন টিকে থাকাও অসম্ভব নয়। তাই বলছিলাম এভাবে আর কয়েকটা দিন টিকে থেকে যদি একটু ভালোর দিকে যায় বা টার্ন নেয় তবে ওকে এখান থেকে কোনো স্যানাটোরিয়ামে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় রিমুভ করাই ভালো। সেই ব্যবস্থাই আপনি যাতে করেন, সেইজন্যই আপনাকে এ-ঘরে ডেকে এনেছি। ডক্টর চৌধুরীও তাই বলছিলেন আজ রাউণ্ডে এসে।

কিন্তু কোনো স্যানাটোরিয়াম তো আমি চিনি না। আপনারা যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন।

একটা কথা কিন্তু আগে থাকতেই আপনার জানা দরকার বীণা দেবী।

বলুন।

সেরকম ভালো কোনো স্যানাটোরিয়ামে রেখে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বেশ কিছু টাকার কিন্তু প্রয়োজন।

সে যা লাগে যেমন করেই হোক আমি যোগাড় করব। আপনি শুধু ব্যবস্থা করে দিন ডাঃ সেন।

বেশ। তাই হবে। আর একটা কথা মনে রাখবেন, এ ব্যাধি বড় সংক্রামক। রোগীর কাছে যাবেন একটু সাবধানে।

করুণ হাসির একটি রেখা বীণার ওষ্ঠপ্রান্তে জেগেই আবার মিলিয়ে যায়। সে ডাঃ সেনের শেষের কথার কোনো জবাব দেয় না।

ডাঃ সেনের বোধ হয় আরো কিছু বলবার ছিল, কিন্তু তিনি সে কথাটা বলতে এবারে যেন কেমন একটু ইতস্তত করতে থাকেন।

বীণা বুঝতে পেরে প্রশ্ন করে, আর কিছু বলবেন ডাঃ সেন?

হ্যাঁ, মানে বলছিলাম কি—

বলুন না যা বলতে চান? ইতস্তত করছেন কেন?

বলছিলাম—মানে আপনার সঙ্গে আপনার ভাইয়ের কি তেমন সদ্ভাব নেই?

চমকে বীণা ডাঃ সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায়, কেন? ও কথা বলছেন কেন ডাঃ সেন?

আজ দুপুরে আপনার কথা আমি পেসেণ্টকে বলেছিলাম—

বলেছিলেন?

হ্যাঁ। কিন্তু সে বললে—

কী বললে সে? ব্যগ্র কণ্ঠে শুধায় বীণা।

সে বললে, তার কোনো দিদি বা বোন নেই। সে একক। সে

কারো সঙ্গেই দেখা করবে না।

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ কণ্ঠে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে বীণা, ও।

হ্যাঁ। তাই বলছিলাম রোগীর বর্তমান যা অবস্থা তাতে করে কোনো প্রকার একসাইট্‌মেন্ট, বুঝতেই পারছেন, একেবারে নিষেধ। আর আমি—আপনাকে আর কি বুঝিয়ে বলব?

আবার স্তব্ধ হয়ে মাথাটা নিচু করে বসে রইল বীণা কিছুক্ষণ। তারপর একসময় ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললে, বেশ। তাই হবে।

বীণার দু'চোখের কোল জলে ভরে যায়।

বীণা বলে, তাই হবে। কোনো সাড়া দেব না, শুধু একটিবার দূর থেকে দেখেই চলে আসব। লালু! বলে ফিরে তাকিয়ে বীণা দেখল লালু সেখানে নেই।

লালু কোথায় গেল?

লালু তার ঢের আগেই একসময় নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। ডাঃ সেন বা বীণা দুজনার একজনও টের পায় নি সেটা।

ওরা দুজনে যখন কথা বলছিল, লালু তখন সোজা গিয়ে হাজির হয়েছে ওদিকে একেবারে ওয়ার্ডে, যেখানে অন্যান্য রোগীদের সঙ্গে শয্যার উপরে ভুলু শুয়ে আছে।

নিঃশব্দে ক্রাচে ভর দিয়ে লালু ভুলুর শিয়রের সামনে এসে দাঁড়ায়।

অন্ধ ভুলু চোখ বুজে শুয়ে আছে।

রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ।

লালু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ভুলুর মুখের দিকে।

তারপর একসময় ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে ভুলুর মাথার রুক্ষ চুলগুলি আলতোভাবে স্পর্শ করতেই চমকে ওঠে ভুলু, ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে?

লালু কিন্তু হাতটা সরায় না। এবারে আরো স্পষ্টভাবে ভুলুকে স্পর্শ করে। তবে কোনো সাড়া দেয় না।

কে? কে? বলতে বলতে ভুলু তার রোগশীর্ণ তপ্ত হাতটি বাড়িয়ে লালুর হাতটা সাগ্রহে চেপে ধরে পূর্ববৎ ক্ষীণ অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে শুধায়, কে—কে?

ভুলু!

কে? কে? লালু? লালু?

ভুলু!

লালু! লালু—সত্যি-সত্যিই তুই এসেছিস ভাই!

ভুলু ভাই!

লালুব হাত দুটো চেপে ধরে আবার ভুলু বলে,—সত্যি! সতি তুই তাহলে লালু!

হ্যাঁ বে! আমি লালু! আমাকে—আমাকে তুই ক্ষমা কর ভাই!

ক্ষমা! না রে না! ও কথা বলিস না…কিন্তু তোর পরীক্ষার খবর কি লালু?

পাস করেছি। আব খুব সম্ভবত প্রথমই হব।

হবি! হবি! আমি জানতাম তুই প্রথম হবি! সত্যিকারের সাধনা কখনো বিফল হয় না রে! দেখ, আমি কতদিন তোকে বলি নি, মানুষের জীবনে বিপদ-দুঃখ আসেই, কিন্তু চেষ্টা আর যত্ন থাকলে সে বিপদ, সে দুঃখও একদিন কেটে যায়! তুই মানুষ হয়ে ওঠ লালু! তোকে দেখে লোকে জানবে, অভাব ও দুঃখের মাঝে যারা আমরা পথের ধারে ছিটকে পড়েছি—আমরা হারিয়ে যাই নি। অন্যের দয়ার প্রার্থী না হয়েও আমরা সফল হতে জানি। আমরা বেঁচে থাকতে পারি।

ওসব কথা এখন থাক্ ভুলু। তুই তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ও। এবারে আমরা দুজনে সংগ্রাম করে পাশাপাশি পথ চলব। কখনো আমরা আর পরস্পর থেকে পরস্পরের দূরে থাকব না। আর

কি জবাব দেবে বীণা ? চুপ করে থাকে।

ভূতোর মাও কি ভেবে আব দ্বিতীয় প্রশ্ন করে না। সিঁ দিয়ে একটু দ্রুতপদেই উপরে চলে গেল।

বীণা সিঁড়ি দিয়েই নামতে লাগল। হাতের মধ্যে ধরা তা একটা ঠোঙায় তখনো আপেল, আঙুর ফলগুলো।

॥ শেষ ॥